সজনীকান্ত দাসের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

জগদীশ ভট্টাচার্য
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়।ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২

প্রাক্‌কথন

বলিষ্ঠ শক্তিশালী পুরুষ সজনীকান্ত ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। অবশ্য সাহিত্যই ছিল তাঁর প্রধান বাহন। খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রগতি-কল্লোল-কালিকলম-প্রভৃতি পত্রিকায় সাহিত্যে নবযুগ সৃষ্টির উল্লাসে তরুণের দল যখন মত্ত ছিলেন, তখন সাহিত্য আদর্শভ্রষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল হচ্ছে মনে করে সজনীকান্ত তার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন। 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় রঙ্গ-ব্যঙ্গ হাসি-মস্করায় তিনি তরুণ সাহিত্যিকদের আঘাতে-আঘাতে জর্জরিত করে তুললেন। আপাতদৃষ্টিতে রক্ষণশীল এই ভূমিকা কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অপরিহার্য ছিল। তরুণদের উৎকেন্দ্রিকতা সংযত করার প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সজনীকান্ত প্রায় একক প্রচেষ্টায় তাঁর সাহিত্যকৃত্য পালন করে গেছেন। কিন্তু এতেই যদি তাঁর সমস্ত শক্তি অপচিত হত তাহলে তাঁর সাহিত্যকর্ম নগণ্য বলেই বিবেচিত হত। কিন্তু তিনি শুধু বিরূপ-সমালোচকই ছিলেন না, মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টিও তাঁর আয়ত্তে ছিল। সব্যসাচীর মতো তিনি এক-হাতে আবর্জনা পরিষ্কার করতে লাগলেন, এবং অন্য-হাতে প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যব্রতীদের সৃষ্টিকে উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চার করতে প্রবৃত্ত হলেন। নিজেকেও মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টিতে নিয়োজিত করলেন।

সজনীকান্তের সাহিত্য-জীবনকে তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে তাঁর সংকল্প ছিল অশিববিনাশ, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর মন্ত্র ছিল নবসৃষ্টি এবং তৃতীয় পর্যায়ে তাঁর লক্ষ্য হয়েছিল ইতিহাসের অবলুপ্ত কক্ষে সত্যের সন্ধান—কালজয়ী সাহিত্য-সাধকগণের কীর্তি-রক্ষা। তিন পর্যায়েই সমালোচক-সত্তার পাশেই ছিল তাঁর সৃজনশীল সত্তা। সজনীকান্ত মূলত ছিলেন কবি। এই কবিতাসত্তাই তাঁকে সহিত্যক্ষেত্রে সত্যকার প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

২.

সজনীকান্তের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা এগারো। প্রথম গ্রন্থ 'পথ চলতে ঘাসের ফুল'। মনে মনে দূর-দূরান্ত ভ্রমণের ফলে ঘাসের ফুলগুলি কবিতা হয়ে ফুটে উঠতে লাগলো। দুটি নমুনা উদ্ধার করা যাক :

পোপোকেটাপেটেলে
তেতলার হোটেলে
দিনভর গান গায় সার্জন স্মিথ

'দোস্ত তারে কহিও
আমি গেছি ওহিও (Ohio)
নাই যদি ভাঙে মান
যাব মনটিথ।'

এবং

জাগো সখি জাগো রে 'বলটিক' সাগরে
উঠল সূর্য যেন গোল পাঁউরুটিটি—
জাগো সখি জাগোরে হিমজল সাগরে
গোল রুটি সূর্য, সেঁকা তার দু-পিঠই।

দু-পিঠ সেঁকা পাঁউরুটি,—সূর্যের এই অভিনব কল্পনা বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব।

কবির দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বঙ্গরণভূমে'। জাতীয়তাবাদী ব্যঙ্গ-কবিতা। স্বভাবতই উত্তরকালে তার আকর্ষণ মন্দীভূত হয়েছে। কিন্তু 'সোনার বাঙলা'র মতো কবিতা সমকালীন উল্লেখ-সত্ত্বেও সহৃদয় সামাজিককে মুগ্ধ করবে। 'কেরানি'র আবেদন তো চিরকালীন।

তৃতীয় কাব্য 'মনোদর্পণ' মনস্তাত্ত্বিক কবিতা। ভূমিকাংশটি উদ্ধারযোগ্য! "হরিধনবাবু বিষ খাইয়া মারা গিয়াছেন। তাঁর শবদেহ হাসপাতালের শবব্যবচ্ছেদাগারের টেবিলে পড়িয়া। হরিধনবাবুর বিধবা পত্নী, অনূঢ়া কন্যা, শবব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তার, পাড়ার পরোপকারী শববাহী যুবকবৃন্দ, শ্মশানের মুর্দোফরাস, শৃগাল ও শকুনি—এই শবদেহ সম্বন্ধে প্রত্যেকের মনের ভাবনা বিচিত্র। প্রত্যেকের দুঃখ-বেদনা ও লোলুপতা কাব্যের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু শবব্যবচ্ছেদকারীর নির্লিপ্ততাকে কাব্য করা কঠিন।

"মনোদর্পণ এই শবব্যবচ্ছেদের কাব্য।"

স্বকপোলকল্পিত কামস্কাট্‌কান ছন্দে রচিত হয়েছে 'ব্যাঙ্' কবিতাটি। 'আমি ব্যাঙ্ লম্বা আমার ঠ্যাঙ্।' কিন্তু আসলে ওটি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যারডি। এর পেছনে লেখকের মনস্তত্ত্বই 'শবব্যবচ্ছেদের কাব্য' হয়ে উঠেছে। মনোদর্পণের শ্রেষ্ঠ প্যারডি 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি। তাতে হুল নেই, আছে অনুকৃত সৃষ্টির দক্ষতা।

বস্তুত সজনীকান্ত যে 'প্যারডি-পারংগম' কবি তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'অঙ্গুষ্ঠ' কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের 'আমি যে প্রথমতম', 'পুংসতীনের স্মরণে অনুপ্রাসরঞ্জন'-প্রভৃতি কবিতায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের অনুপ্রাস-বাহুল্যকে ঠাট্টা করা হয়েছে। কিন্তু প্যারডি-কাব্যে ব্যঙ্গের হুল গৌণ হয়ে হাস্যরসই প্রাধান্য লাভ করে। মূল কবিতার অনুকরণের সাফল্যই প্যারডির প্রাণ।

সজনীকান্ত রবীন্দ্রকাব্যের প্যারডি-রচনায় বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন 'অঙ্গুষ্ঠ' কাব্যে। আমরা মনোদর্পণের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটির উল্লেখ করেছি। তেমনি সার্থক কবিতা অঙ্গুষ্ঠের শীতলা, প্যাঁচা, গদি -প্রভৃতি কবিতা। 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী' উর্বশীর সৌন্দর্যের সঙ্গে উপমিত হয়েছেন দেবীকুলে অবজ্ঞেয়া গর্দভবাহিনী শীতলা। পরিহাসই এর প্রাণ। বলাকার 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা' প্যাঁচা কবিতায় হয়েছে, 'ওরে হুতোম, ওরে আমার প্যাঁচা।' বলাকারই 'হে বিরাট নদী' হয়েছে 'গদি' কবিতার 'হে প্রাচীন গদি'।

'অঙ্গুষ্ঠ' গ্রন্থে আরেক-ধরনের প্যারডি আছে। একটি শব্দের আদল-বদল করে একটি কবিতা। 'কল্পনা'র 'অশেষ' কবিতার প্রথম পংক্তি ছিল 'আবার আহ্বান?'— তা 'খাবার আহ্বান' হয়ে স্বতন্ত্র কবিতা সৃষ্ট হয়েছে। তেমনি 'ক্ষণিকা'র উদ্‌বোধন কবিতার প্রথম পংক্তি ছিল, 'শুধু অকারণ পুলকে'; তার বদলে 'শুধু অকারণ কুলোকে' হয়ে আরেকটি স্বতন্ত্র কবিতার জন্ম হয়েছে। একে শব্দগত প্যারডি বলা যেতে পারে। মূলের ছন্দ অবশ্য রক্ষিত হয়েছে।

'অঙ্গুষ্ঠ' কাব্যে প্যারডি রচনার পরিসমাপ্তি। পরবর্তী জীবনে, ১৩৪৭ সালে সচিত্র হাসির কাব্য 'কেড্‌স ও স্যান্ডাল' প্রকাশিত হয়। তাতে ব্যঙ্গের হুল নেই, আছে বিশুদ্ধ হাসি। ট্র্যাজেডী কবিতাও হাসির তুফানে ভেসে গিয়েছে।

৩.

সজনীকান্ত কবি হিসাবে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন 'রাজহংস' কাব্যে। রাজহংস প্রকাশিত হয় ১৩৪২ সালের চৈত্র মাসে। কিন্তু কবি হিসাবে সজনীকান্তের নবজন্মের ইতিহাস শুরু হয়েছে ১৩৩৮ সালে। ১৩৩৬ থেকে ১৩৩৮, এই দু-বছরের মধ্যেই প্রথম চারখানি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য কবিতা-রচনার ইতিহাস অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এতদিন তিনি রঙ্গব্যঙ্গ রচনার মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন। ১৩৩৮ সালে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি নিজের আসল সত্তাকে খুঁজে পেলেন। ১৩৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথের সত্তরবর্ষ-পূর্তির জয়ন্তী-উৎসব প্রতিপালিত হয়। শনিবারের চিঠিরও 'জয়ন্তী-সংখ্যা' প্রকাশিত হয়। তাতে রবীন্দ্র-বিদূষণ চরম পর্যায়ে পৌঁছোয়। কিন্তু এই সংখ্যারই শেষে 'রবীন্দ্রনাথ' বলে একটি কবিতা মুদ্রিত হল। এই সংখ্যার সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গোত্রের এই কবিতা। রবীন্দ্রনাথকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এটি যেন সজনীকান্তের গুরুপ্রণাম। তার পর থেকে একটি-একটি করে কবিতা রচিত হল। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, মুক্তবন্ধ ছন্দে কবিতা লেখা। অবশ্য তাঁর মুক্তবন্ধ কবিতাগুলি সর্বত্রই অমিল।

রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'য় মিশ্র-কলাবৃত্ত ছন্দের মুক্তবন্ধ রূপটি ব্যবহার করেছিলেন; আর দলবৃত্ত ছন্দের মুক্তবন্ধ রূপ প্রকাশিত হয়েছে 'পলাতকা'র কবিতায়। কিন্তু শুদ্ধ কলাবৃত্ত ছন্দের মুক্তবন্ধ রূপ-সৃষ্টির দিকে তিনি আগ্রহ দেখাননি। সজনীকান্ত রাজহংস কাব্যগ্রন্থে কলাবৃত্তের মুক্তবন্ধ রূপটির বহুল ব্যবহার করেছিলেন। এ ছন্দের আবিষ্কারক হয়তো তাঁকে বলা যাবে না; কিন্তু এই ছন্দকে তিনিই বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। 'রাজহংস' পড়ে কবিগুরু বলেছিলেন, আমি পারিনি, কিন্তু ও পেরেছে। সজনীকান্ত যে-রীতিতেই মুক্তবন্ধ রচনা করুন না কেন, তাঁর কাব্য সর্বত্রই অমিল। কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত রাজহংস-এর 'কে জাগে?' -প্রভৃতি কবিতা, কিংবা 'পঁচিশে বৈশাখ-এর 'মর্ত্য হইতে বিদায়'-প্রভৃতি কবিতা বাংলা কাব্যলোকে অবিস্মরণীয় মহিমা অর্জন করেছে।

৪.

সজনীকান্তের নিভৃত মনোলোকের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে রাজহংস-এর 'পান্থপাদপ' কবিতায়। তাঁর জীবনে একাধিক নারীর আবির্ভাবকে তিনি গুরুত্ব দেননি। বলেছেন:

তোমরা সবাই সত্য আমার অঙ্কের ইতিহাসে,
সবাই মিথ্যা ছায়াছবি পরদায়—
অনাদি অসীম যাত্রা আমার তার ইতিহাস নাই।
মরুপথে যে বা চলিয়াছে সখী, মরীচিকা গুনে-গুনে
প্রহর গণিয়া চলা কি তাহার সাজে ?
আঁধি আসে আর আঁধি সরে-সরে যায়—
ধু-ধু মরুভূমি পড়ে থাকে সীমাহীন।
তোমরা এসেছ, তোমরা গিয়াছ সরে,
একে একে সখী, সব ছায়া রোদ হবে,
সব আঁধি পিছে পথের মতন পিছনে রহিবে পড়ে।

* * *

চির পথিকের অজানা যাত্রাপথে
তোমরা হে সখী, ছায়া-সুশীতল পাদপ হইতে পার,
আঁধার মাটিতে শিকড় গাড়িয়া আছ।
আমার জীবনে শুধু
তোমা সবাকার খন্ড-খন্ড ছায়াময় ইতিহাস।
এর বেশি কিছু নহে
আমি তোমাদের নহি—
চিররৌদ্রের চির-আলোকের সঙ্গী পথিক আমি।

এই অস্বীকৃতিকে নস্যাৎ করে তাঁর জীবনের সর্বশেষ কাব্য, ১৩৬৭ সালে প্রকাশিত, 'পান্থপাদপ' গ্রন্থে একাধিক নারীর আবির্ভাব সত্য হয়ে উঠেছে। তার ফলে 'পুনর্বসন্ত'-এর মতো কবিতা রচনা সম্ভব হয়েছে। কবি সজনীকান্তের এই অন্তরঙ্গ আত্মকথা মধুর -রসাত্মক কাব্যে মধুস্বাদী হয়ে তাঁর বহু-বিচিত্র কবিমানসকে নিঃশেষে নির্বারিত করেছে।

৩০.১১.২০০১ জগদীশ ভট্টাচার্য

সূ চি প ত্র

পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল (১৯২৯। ভাদ্র ১৩৩৬)

বঙ্গরণভূমে (১৯৩১। আশ্বিন১৩৩৮)

মনোদর্পণ (১৯৩১। আশ্বিন ১৩৩৮)

অঙ্গুষ্ঠ (১৯৩১। আশ্বিন ১৩৩৮)

রাজহংস (১৯৩৫। চৈত্র ১৩৪২)

আলো আঁধারি (১৯৩৬। বৈশাখ ১৩৪৩)

কেড্‌স ও স্যান্ডাল (১৯৪০। ভাদ্র ১৩৪৭)

পঁচিশে বৈশাখ (১৯৪২। বৈশাখ ১৩৪৯)

মানস-সরোবর (১৯৪৪। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১)

এ শুধু তোমারই তরে

এ শুধু তোমারি তরে তুমিই বুঝিবে সখি,
ঘাসের ফুলের কিবা মূল্য,
সার্থক হবে ফুল নিমেষেরও তরে যদি
তুমি হয়ে ওঠ উৎফুল্ল।

তোমার লাগিয়া সখি

তোমার লাগিয়া সখি, গিয়েছিনু বহু দূর পার হয়ে নদী-গিরি-সিন্ধু,
আঁধার তিমির ভেদি গহন বনের মাঝে আহরিতে ফুল-মধু-বিন্দু
বাঘের গুহার মুখে ক্ষুদ্র ঘাসেরা যেথা আপনিই ফুল হয়ে ফুট্‌ছে,
বনের মেয়ের পায়ে সবল বনের যুবা অসহায় যেথা মাথা কুট্‌ছে,
যেখানে সাপেরা চলে রেখে যায় ঘাসবনে মসৃণ বক্ষের চিহ্ন,
ক্বচিৎ আলোকরেখা ভয়ে-ভয়ে পশে যেথা তিমিরাবরণ করি ছিন্ন।

যেখানে জলের ঢেউ উদ্দাম-উত্তাল, যেখানে জলের ঢেউ স্তব্ধ—
রহি রহি ওঠে যেথা তিমির লেজের ঘায়ে বরফের চাপভাঙা শব্দ।
যেখানে কাঁটার গাছে ফুটেছে রঙিন ফুল বিতরিছে মৃদু মধুগন্ধ,
কাঁটা-ঘায়ে আঙুলের ক্ষতমুখে রক্তের লাল রঙ দেখে মহানন্দ।
তুষিতে প্রিয়ার মন অবোধ যুবক যেথা ক্ষুরধার নদী যায় সাঁতরে,
হাতি-বাঘ-গণ্ডার-সিংহের বাসভূমে নির্ভয়ে ধায় কুহুরাত্রে।
যেখানে ঘাসের বুকে ক্ষুদ্র শিশিরকণা ঝলমল করে ক্ষীণ রৌদ্রে,
আঁখিতে আঁখিতে প্রেম, প্রকাশের ভাষা আজো
পায় নাই পদ্যে কি গদ্যে।
সেই ফুল সেই ভাষা সেই শিশিরের কণা গাঁথিয়া এনেছি মোর ছন্দে,
কণ্ঠে পরহ মালা কানে-কানে কহ কথা ধরা দিয়ে দুটি বাহুবন্ধে।
এ-শুধু তোমারি তরে তুমিই বুঝিবে সখি ঘাসের ফুলের কিবা মূল্য,
সার্থক হবে ফুল নিমিষেরও তরে যদি তুমি হয়ে ওঠ উৎফুল্ল।

সোনার বাঙলা

অহো সোনার বাঙলা সোনার বাঙলা
সোনার বাঙলা আলবৎ,
যেথা বাহির হইতে গুল্মেরা আসি
বৃদ্ধি পেতেছে শাল-বৎ—
আর সড়ক ছাড়িয়া ধরিতেছে সবে
অলি-গলি আব আল্-পথ!

হেথা আম্র ক্রমেই হতেছে কদলী
কচু হইতেছে রম্ভা—
হেথা মহিষ-শৃঙ্গে বসিয়া ভৃঙ্গ
ভাবে গেল তার দম্ বা ;
আর তিন-কোণা ক্রমে হয়ে যায় গোল
চ্যাপ্টা হতেছে লম্বা।

হেথা কবে না-কি কোন্ বিজয়সিংহ
জয় করে এল লঙ্কা,
মোরা তাই নিয়ে আজো দিচ্ছি লম্ফ
পিটিয়ে উদর-ডঙ্কা,
আজো লঙ্কার ঝালে চক্ষু ভাসায়ে
দেখাই সবারে শঙ্কা।

আর কবে কেটা গিয়ে শাসন করিল
মালয়ের দ্বীপপুঞ্জ,
দেখ 'লেজারে' হিসাব টুকিতে-টুকিতে
লাফায় তা নিয়ে কুঞ্জ,
কবে বাপ-পিতামহ খেয়ে গেছে ভাত
খালি পেটে স্মৃতি ভুঞ্জ।

কবে বিবেকানন্দ শিকাগোয় গেল
নিখিল-ধর্ম-সঙ্ঘে,

তাঁর বক্তৃতা-চোটে 'থ' বনিয়া সবে
সেলাম করিল বঙ্গে,
এল বাঙালির ছেলে সদর্পে ফিরে
রণজয় করে রঙ্গে!

কবে পিঠ আমাদের চাপ্‌ড়িয়ে গেছে
দাদাভাই আর গোখ্‌লে,
'ওই বোম্বে-মারাঠা চল্‌তেছে পথ
শুধু আমাদের নক্‌লে!'
তাই ফোঁস করে ফুলে ওঠে ল্যাজখানা
অকর্মা বলে বক্‌লে।

কবে লাটগিরি ছেড়ে দেশের জন্য
কয়েদ খাটিল বন্দ্যো,
আর পাল মহাশয় সাগর-পারেতে
দরজা করিল বন্ধ,
আর বসু ও ঘোষেতে অবাক করিল
আছে ইথে কিবা সন্দ?

কবে বারীন গেছ্‌ল আন্দামানেতে
কানাই ফাঁসির কাষ্ঠে,
আজো সেই ওজুহাতে চাই গুরুপদ
সমাজে এবং রাষ্ট্রে ;
দেখ অন্ধ হয়েও রাজ্যের ভার
নিয়েছিল ধৃতরাষ্ট্রে।

আজো অলিতে-গলিতে কীর্তি কাদের।
যথা দর্দুর-ছত্র,
যত বাড়িছে কীর্তি বেড়ে যায় ততো
তরুণ মাসিকপত্র!
আর যে যত চ্যাঁচায় সেই ততো বড়
প্রমাণ হতেছে অত্র।

যেথা সাবু খেয়ে-খেয়ে নিয়ত যাহারা
চক্ষে দেখছে সর্বে,
সেথা স্বাধীনতাকামী বীরেরা সভায়
ফিরছে অশ্রু বর্ষে—

আব	দেশের জন্য যে তুলিছে চাঁদা
টিপে দেখ, পাকা চোর সে।

মোরা	ভাবি নিশিদিন মোদের অতীত
কীর্তি কাড়াব জন্যে,
এই	সকল দুনিয়া আছে ওৎ পেতে
যেন সারমেয় হন্যে,
আর	এদিকে মোদের ঘর ভরে গেল
যত বিদেশের পণ্যে।

মোবা	ভুঁড়ি মেরে গায়ে ফুঁ দিয়া চলিব
সেটা বরাবব লক্ষ্য,
আর	শাস্ত্রও না-কি লিখেছে জীবের
এক গতি শুধু মোক্ষ,
বল	কি করিব পায়ে বাঁধা যে শিক্‌লি
খসে গেছে দুই পক্ষ।

হেথা	অবাক হইবে দেখ যদি, যত
ঝুটা-মেকিদের কাণ্ড,
করে	বুজরুকি আর চালাকিতে এরা
নস্যাৎ ব্রহ্মাণ্ড,
ঠিক	যেমন মদ্য হেথাকার লোক
তাহারা যোগ্য ভাণ্ড।

হেথা	চোরে নিয়ে গেলে কানদুটো কারো
গণকে দেখায় কুষ্ঠী,
আর	স্বাধীন হবার প্রথম সোপান
প্রভাতে ভিক্ষামুষ্টি,
কষে	লাথি ও চাবুক মারে যারা, শুধু
তুলি তাহাদের গুষ্টি।

তবু	দিনের আলোকে পরাধীন মোরা
স্বাধীন হই যে রাত্রে,
অহো	প্রেয়সী যখন কঠিন-কোমল
পরশ বুলায় গাত্রে,
আর	দেবতা সাজিয়া হুঙ্কার করি
শিখাই ধর্ম-শাস্ত্রে।

গাই　　সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা
　　　জননী বাঙলা ধন্য,
করি　　আপিলে-আপিলে অন্নভিক্ষা
　　　দুর্ভিক্ষেরই জন্য,
আর　　কৃষ্ণ সাজিয়া ধর্ম-যুদ্ধে
　　　বাজাই পাঞ্চজন্য।

যারা　　শামুক দেখিয়া ভয় পায়, হেথা
　　　তারা বাজাইছে শঙ্খ,
যারা　　কড়া ও গণ্ডা শেখেনি তারাই
　　　কষিছে জাতীয় অঙ্ক,
আর　　পদ্ম তুলেছি বলিয়া লাফায়
　　　মুঠি ভরে নিয়ে পঙ্ক।

যারা　　নিজ পত্নীরে সযতনে তুলে
　　　দেয় অপরের বক্ষে,
দেখ　　নারীর মহিমা কীর্তনে তার
　　　অশ্রু ধরে না চক্ষে,
শেষে　　ধর্মের নামে আশ্রম এক
　　　খোলে সে নিদেন-পক্ষে।

হেথা　　বিলাতি খেতাব ছেড়ে দেওয়াটাই
　　　সবচেয়ে বীরকর্ম,
এরা　　নারীর আঁচল আশ্রয় করি
　　　পালে রাষ্ট্রীয় ধর্ম।
হেথা　　সে-ই বড় নেতা পাতলা যাহার
　　　কান, আর পুরু চর্ম।

হেথা　　যে-বা যত ভুল ইংরেজি লেখে
　　　সে-ই ততো বড় পণ্ডিত,
আর　　সে ততো সেয়ানা কাঁদিয়া যে করে
　　　পরের যুক্তি খণ্ডিত,
হেথা　　মৃত নেতাদের নামগান-গুণে
　　　চট্ করে হয় রণ জিত।

হেথা　　জাতীয় সমরে যুবা-সৈনিক
　　　যেন পারাবত লক্কা,
কারো　　ভাঙা শির-দাঁড়া, সম্বল কারো
　　　ঘুণধরা বুকে যক্ষ্মা,

যারা বাঁচিয়া বাঁচাবে জননী-বঙ্গে
তাহারা লভিছে অক্কা!

অহো সোনার বাঙলা সোনার বাঙলা
জয় মা হলুদ-বর্ণে,
তবে এ যে জন্ডিস্-হলুদ, জননী,
নহ হরিদ্রা স্বর্ণে,
আর সবাই হেথায় গুরু কে-বা কার
মন্ত্র লইবে কর্ণে!

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে

যে কাজ করেছি শুরু, এই ঘোর দারুণ দুর্দিনে,
রন্ধ্রহীন অন্ধকার পথে জ্বালায়ে শঙ্কিত দীপ
যাত্রা করিয়াছি কয়জনা। অনুভবে পথ চিনে
ফিরিতেছি জীবনের খোঁজে, প্রাণের বজ্রাগ্নি টিপ
অনুক্ষণ জ্বলিছে ললাটে হোমাগ্নি-শিখার মতো।
চারিদিকে মৃতদেহ, কৃমিকীট করে কিলবিল।
শবাসনে বসিতে সাধনা, ধরি কাপালিক ব্রত।
চৌদিকে কঙ্কাল-শব, স্তব্ধ মৌন ভয়ার্ত নিখিল,
প্রতীক্ষা করিয়া আছি প্রাণ কবে পাবে সাড়া ধীরে,
জীবনের রক্তরাগ বহ্নিবৎ উদয়-অচলে
চকিতে উঠিবে জাগি আঁধার তিমির-বক্ষ চিরে।

হেরিতেছি রহি রহি শবলেহী চিতার অনলে
শিবা-সারমেয়দল, দেয় মিথ্যা প্রাণের আভাস
চিৎকারে ও কোলাহলে, তারা করে মৃত্যুর সাধনা—
গলিত শবের লাগি প্রতীক্ষিয়া আছে বারোমাস
কাড়াকাড়ি মহোল্লাসে! মনে হয় প্রাণ-আরাধনা
তারাও করেছে শুরু, ভ্রান্তি জাগে শঙ্কিতের মনে ;
কৃমিকীটে প্রাণ ভাবি নমস্কার করে নিবেদন ;
হাসে মহাকাল ঊর্ধ্বে অন্ধকার কটাক্ষ-ঈক্ষণে,
জীবন শিহরি উঠে, অট্টহাসি হাসিছে মরণ।

ওদেরে করি না ভয়, কৃমিকীট-শিবা-সারমেয়
পদতলে দেই স্থান, মোরা ফিরি তাদের সন্ধানে

ভয়ার্ত কুণ্ঠিত যারা, জরাগ্রস্ত, আরো ঘৃণ্য হেয়,
মিথ্যা জানি মত্ত যারা প্রতিদিন, কৃমিজয়-গানে,
পূজে মৃত্যু জীবন-বাখানি ; পূতিগন্ধ অন্ধকারে
পড়িয়া কহিছে ডাকি, 'জীবনের পেয়েছি আভাস—'
পঙ্কে বসি মুগ্ধ রহে কল্পিত পদ্মের গন্ধভারে—
এরা আবো ভয়ঙ্কর, মৃত্যু ও মিথ্যার এরা দাস!

দুঃখ হয়, একদিন মরণে করিয়া অতিক্রম
উত্তরিল যেইজন মৃত্যুব অতীত প্রাণলোকে,
দিশাহারা সেও আজি, তারো চোখে লেগেছে বিভ্রম,
পচা শবে প্রীতি তার বিপরীত চিতার আলোকে!

আবো যারা একদিন সুবিপুল প্রাণের স্পন্দনে
জাগিয়া কাঁপিয়াছিল ঊর্ধ্বশিখা প্রদীপের মতো,
তারাও আবদ্ধ হায়, ক্লেদ-পঙ্ক-শবের বন্ধনে
বিস্মৃতিব তমসায় কৃমিকীট জয়গান-রত।
'এ মৃত্যু ছেদিতে হবে'—আমরা ছিঁড়িব মায়াজাল,
আপনা-বিস্মৃত যারা প্রাণ পাবে তীব্র কষাঘাতে।
প্রাণেব প্রতিষ্ঠা করি, বিদাবিয়া মৃত্যুর আড়াল,
থাক্ শিবা-সারমেয়-কৃমিকীট, ক্ষতি নাই তাতে!

কেরানি

নহ পিতা, নহ পুত্র, নহ ভ্রাতা, নহ জ্যান্ত প্রাণী—
মসীজীবী, বঙ্গের কেরানি।
দশ যবে ফস্ করে বেজে যায় তব ঘটিকায়—
ছ্যাঁৎ করে ওঠে প্রাণ, অন্ন দুটি ঠেলে পেটটায়—
হাজিরায় 'লেট' আর সাহেবের খিঁচুনির ভয়ে,
আঁটিতে-আঁটিতে কাছা তালি দেওয়া ছাতাখানি লয়ে
ঊর্ধ্বশ্বাসী হয়ে—
চুপি চুপি প্রবেশিয়া তীর্থসার আপিসের মাঝে
লাগ নিজ কাজে!

নাসিকার অগ্রভাগে নিকেলের চশমাটি টানি
বসে থাক নীরবে, কেরানি।

ফাইলের গাদা যত শোভা পায় নয়নাগ্রভাগে—
লিখিতে-লিখিতে খাতা, কত কী যে মনে তব জাগে ;
যত্নে কেনা পোনামাছ, পড়ে নাই একখণ্ড পাতে—
হেবোটা দুরন্ত বড় কোনো ফাঁকে ওঠে যদি ছাতে!
এই মাসটাতে—
কত যে খরচ আছে, ত্রিশটাকা মাত্র যে সম্বল!
চক্ষে আসে জল!
বড়বাবু মহা খাপ্পা, অকারণে নিকটে আহ্বানি
গালি পাড়ে, শুনিয়া কেরানি
ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে থাক, নিরুত্তরে মাথা চুলকাও,
সাহেব আসিছে বুঝি, ক্ষণে-ক্ষণে তাই চমকাও!
মেয়েটা অসুখে ভোগে, মাসান্তে যে বাড়ন্ত সংসার—
শুধিতে হইবে কাল মুদি আর তেলওলার ধার,
চিন্তা-পারাবার,
অস্থিসার বক্ষে তব, তবু মুখে আন শীর্ণ হাসি—
সাহেবে সম্ভাষি।

সর্বনাশ! আপিসেতে ফিস্‌ফিস্ করে কানাকানি,
আপিসের যতেক কেরানি,
হল বুঝি স্টাফাধিক্য, রিট্রেন্‌চ্‌ড হইবে কেহ-কেহ,
'আমি না-কি' 'আমি না-কি', প্রত্যেকেই করিছ সন্দেহ ;
দুর্গা-কালী ইষ্টনাম, কার্য-ফাঁকে লহ মনে-মনে,
প্রাণঘাতী দৃশ্য কত জেগে ওঠে সজল নয়নে,
খাট প্রাণপণে!
বড়বাবু ইথে যদি কিছুমাত্র হয়েন সদয়,
চাকুরিটা রয়!

নহ তুমি পতি কারো, গৃহ নয় তব গৃহখানি,
তুমি যে গো সামান্য কেরানি।
স্বামী বলে তব 'পরে নাহি কারো কোনো দাবি-দাওয়া,
কাজ তব আপিসের লেজারের খেয়াতরী বাওয়া—
অসুখে কে ভুগে মরে পথ চেয়ে কাঁদে কোন্ নারী,
অর্থের অভাবে দিন, চড়ে কিম্বা নাহি চড়ে হাঁড়ি—
দেখিবে বিচারি—
তুমি যে কেরানি মাত্র, নাহি তব সেই অধিকার
ভবে কেবা কার!

আপিসটি সত্য শুধু ; অন্য সব মিথ্যা মায়া জানি
চলিয়াছ, আপিসে কেরানি!
নহ তুমি পুত্র কারো, তাড়াতাড়ি না খেয়ে সকালে
যেতে যদি হয় কভু, কারো অশ্রু বহে না দু-গালে,
পিতা তুমি নহ ওগো, সহিবে কে পুত্রের আব্দার,
কন্যা তব নাহি বাড়ে বিবাহের কি চিন্তা তাহার,
বন্ধু কে কাহার—
সার শুধু এ জগতে শ্বেত ওষ্ঠে একপেশে হাসি
সর্ব দুঃখনাশী!

পিতা-পিতামহ তব, খেয়ে বুঝি আদাজলপানি
মনে জানি, জন্মিবে কেরানি
ধন্যিতে তাঁদের বংশ, রেখে গেছে ভূমি কাঠা দেড়
তদুপরি কোঠা এক, বহুপুণ্য পূর্বজনমের—
বাড়িওলা মাসারম্ভে তব দ্বারে নাহি দেয় হানা ;
চুন-বালি খসে খসে যদিও দুর্দশা হল নানা—
তবু বাড়িখানা
আছে বলে, মস্তকেতে নীলাকাশ ধরে না চাঁদোয়া,
চলে বসা-শোয়া।

ঠুলিবাঁধা নেত্রে তুমি টানিতেছ আপিসের ঘানি,
বলীবর্দ হে বঙ্গকেরানি!
ঘোরানির ভাবাবেশে চক্ষুদুটি আছ মুদিয়াই,
টানিতেছ অবিরাম, নাহি বর্ষা গ্রীষ্ম-শীত নাই—
নাহি রঙ্গ নাহি ব্যঙ্গ শ্যালী নাই নাহিকো ইয়ার—
অ্যাকাউন্ট কষে কষে চক্ষে যবে দেখ আঁধিয়ার,
তবু কি নিস্তার
আছে হায়, যতক্ষণ শীর্ণ দেহে রহে জীর্ণ প্রাণ
নাহি পরিত্রাণ।

তবু তুমি চলিয়াছ আপন অদৃষ্ট তব মানি—
হে নিরীহ বিশ্বাসী কেরানি!
রাগ নাই দ্বেষ নাই নাই ঘৃণা নাই অপমান,
কার্য-ফাঁকে যদি ভাব কি করিছে পত্নী ও সন্তান
শান্ত দ্বিপ্রহরে গৃহে, নিরুদ্বেগে চশমাটি খুলি
মুছে ফেলে আঁখিবাষ্প আর আপিসের পূত ধূলি—
লেখনীটি তুলি

ডেবিট-ক্রেডিট আদি দিস্তা-দিস্তা লেখ অবিশ্রাম,
বহে কালঘাম!

বড়বাবু-সাহেবের পদাম্বুজে নিত্য তৈল দানি
হাসিমুখে চলেছ কেরানি,
বর্ষ শেষে চিন্তা শুধু, নাহি জানি লিফ্‌ট্‌ হবে কার
বোনাস্‌ লভিবে কে কে, আশা কানে কহে বারবার
ভাগ্য তব সুপ্রসন্ন, অন্তরেতে চাপিয়া উল্লাস
ছোটাছুটি আপিসেতে মুখে দ্রুত তুলি তপ্ত গ্রাস
দীর্ঘ বারোমাস—
বিড়ালের ভাগ্যে তবু শিকাখানি নাহি যদি ছেঁড়ে
দেনা যায় বেড়ে!

কিছু রস নাহি কিগো? কিছু যেন আছে অনুমানি—
তখনও থাক কি কেরানি!
রবিবার প্রাতে যবে বস তুমি চায়ের আড্ডায়—
সাহেবের শ্রাদ্ধ কর, মার যত উজির-রাজায়,
দৈনিক 'নায়ক' আর সাপ্তাহিক 'শিশির' পড়িয়া—
আপিস ভুলিয়া যাও, মুক্তি পায় তব বদ্ধ হিয়া
উঠে সরসিয়া,
ফুলবল ম্যাচ আর ঘোড়দৌড় আসে মাঝে-মাঝে
ভুলাইতে কাজে!

তবু তুমি কেরানি যে, চুকে যায় সব হানাহানি—
নিতান্তই নিরীহ কেরানি!
শূন্যে তুমি ঝুলিতেছ বোঁটাহীন পুষ্পটির মতো,
ন্যুব্জ দেহ দৃষ্টিহীন একাসনে বসিয়া সতত,
গৃহ-পরিজন ভুলি চলিয়াছ মৃত্যু-অভিসারে,
ক্ষণে-ক্ষণে ভ্রান্তি আসে সাহেবের কর্কশ হুঙ্কারে
চেন আপনারে—
খাতা আর লেখনীতে জীবনের অনন্ত সাধনা
ইষ্ট-আরাধনা!

মর্ত্য হইতে সরস্বতী-বিদায়

কাতরে ভারতী কন, "শুন-শুন দেবগণ,
আমার দুর্গতি বাখানিব,
মর্ত্যেতে বাঙালা নাম— আছে অনঙ্গের ধাম,"
সভাজন কহে, "শিব, শিব!"
"সেথায় তরুণদল— জীবনে হয়ে বিফল
ব্রতী হল ব্রহ্মচর্য-ব্রতে,
মাসিক ছাপিয়া তারা, অধিনীরে করে তাড়া—
অঙ্গ মোর ভরি দিল ক্ষতে।
বঙ্গের কি গাব গুণ— তরুণ টানিছে গুন,
নয়ন অরুণ বারুণীতে ;
ভাসিতেছি বিভু স্মরি, কলার মান্দাস 'পরি,
প্রগতি কল্লোল-কালিন্দীতে।
অনঙ্গ ধরিয়া অঙ্গ শান্তি মোর করে ভঙ্গ,—
পীড়িতা নিতম্ব-স্তনভারে,
লোলুপ-লালসা লালা— মুখ-বুক করে জ্বালা,
ডোবে পদ্ম পঙ্কের পাথারে।
মরাল বাহন মম হয়েছে শকুনি-সম,
শ্মশানে করিছে শবাহার,
বীণা ফেলে ঝাঁটাগাছি দেছে, তাই ধরে আছি
শতমুখী সঙ্গীত-আধার।
বিমলিন নগ্ন গায় বসালো আমারে, হায়,
রাজপথে জনতার মাঝে,
কামাতুর দৃষ্টি হানি— মোরে করে টানাটানি
বাঁচি আমি যদি মরি লাজে।
হংসপদ্মাসন যার আকাঙ্ক্ষিত কমলার,
বীণা যার মোহিল ত্রিদিব—
অনঙ্গের রঙ্গধামে মর্ত্যে খ্যাত বঙ্গ নামে"—
দেবগণ কহে, "শিব, শিব!"
"সে নন্দন-নন্দিতার সীমা নাই লাঞ্ছনার
প্রজাপতি করহ বিহিত—
ক্লেদ-পঙ্কে করি বাস ছিন্ন-দেহ নগ্নবাস,
সবি মোর লাগে বিপরীত।
আমার পূজার ছলে মিলেছে তরুণদলে
আমারে করিতে বহিষ্কার—

নিত্য যেথা পূজা মোর সেথায় পশিয়া চোর
ধর্ম-ছলে করে অধিকার।
পূজা যেথা সত্যকার সেথা ঢোকে মিথ্যাচার
মোরে নিয়ে পিশাচের খেলা
সহে না হে চতুর্মুখ, যন্ত্রণায় ফাটে বুক,
হে বিধি, বাঁচাও এই বেলা!"
নীরব চতুরানন সজল হল নয়ন,
ক্ষণপরে কন মৃদু হাসি—
"বন্ধ এবে যজ্ঞযাগ দেবতার রাজ্যভাগ
জনগণ লইতেছে আসি।
তুমি মিছা কর শোক দেবের এ দেবলোক,
মর্ত্যলোকে দেবতা গণেশ,
ভোগ পাবে সুরসাল গণবাদ যত কাল
প্লাবিত করিবে সর্ব দেশ।
'খোকা ভগবান' নামে গজানন বঙ্গধামে
সম্প্রতি খুলছে রাজ্যপাট—
তুমি মাতা এসো চলে চড়ি স্বর্গ-চতুর্দোলে—
বঙ্গভূমি হউক স্বরাট্।"

ব্যাঙ্

আমি ব্যাঙ্
লম্বা আমার ঠ্যাং
ভৈরব রভসে বরষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাং।
আমি ব্যাঙ্
আমি পথ হতে পথে দিয়ে চলি লাফ ;
শ্রাবণ-নিশায় পরশে আমার সাহসিকা
অভিসারিকা
ডেকে ওঠে 'বাপ-বাপ'।
আমি ডোবায়-খানায় কাদায়-ধুলায়
খাটিয়ার তলে—কিম্বা ব্যবহারহীন চুলায়,
কদলী-বৃক্ষের খোলেও কখনও রহি ;
ব্যাঙাচি রূপেতে বাঁদরের মত লেজুড়েও আমি সহি।
আমি প্রাতে ও দুপরে বিকালে ও সাঁঝে।
যখন ঝিল্লি ঝাঁঝর কাননে-কাননে বাজে,
গেয়ে যাই গান
'আসমান'
ফেড়ে-ফেড়ে,
মিছে বলে লোক গলাটা আমার হেঁড়ে।
আমি 'শির' তুলে হেরি 'কেয়ার' করিনে কারেও,
মোরে আটকাতে নারে কাঁটার বেড়ার তারেও,
আমি কচুর বনের আড়ালেতে রহি মাঝে-মাঝে দিই লাফ,
গিন্নি মিছাই দেখায় যে ভয়, 'সাপ ওগো ওই সাপ'!
আমি সাপেরে করিনে কেয়ার,
দাঁড়াওলা যত কাঁক্ড়ারা মোর এয়ার।
আমি ব্যাঙ্ আমি বিদ্রোহী ব্যাঙ্
আমি উল্লাসে কভু নেচে উঠি ড্যাং-ড্যাং,
আমি ব্যাঙ
দুইটা মাত্র ঠ্যাং!

আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই,
আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর-ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।
আমি ভীম ভুজঙ্গ ফণিনী দলিতফণা,
আমি ছোবল মারিলে নরের আয়ুর 'মিনিট' যে যায় গনা ;
আমি নাগশিশু, আমি ফণীমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি,
আমি 'বে অফ বিস্কে' 'সাইক্লোন' আমি মরু-সাহারার
'আঁধি'---
আমি বেদুইন, আমি মহম্মদ ঘোরী,
আমি কিশোরী মেয়ের নাকের নোলক
ঢাকীদের আমি শখের ঢোলক
সৌখিন যত মডার্ন ছেলের West End হাতঘড়ি।
আমি বেন্দা কলুর ঘানি,
আমি খোদার ষণ্ড, নিখিলের নীল খিলানে যে ক্ষুর হানি—
গলা 'ধাক্কার ধমক' আমি যে 'ঝরনার কুলকুচি'
'দাড়িম ফাটা'র অসহ্য 'ক্ষুধা' পুঁটি মোদকের লুচি।
আমি 'ঝড়' আমি 'কড়-কড়-কড়', K M. Das-এর চটি,—
মেমসাহেবের cero pearls আমি মেছুনীর আঁশবটি,
আমি যুবতী মেয়ের গলার পুষ্পহার
আমি বাসর ঘরের মশক, আমি বাসক-তোষকে ছার ,
আমি নবীন, আমি যে কাঁচা,
আমি বাহির হয়েছি ভাঙিয়া ফেলিয়া খাঁচা।
আমি 'হে বিরাট নদী' বৈশাখ আমি রুদ্র
তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহী, আমি ভাইকম শূদ্র।
আমি 'এ্যারোপ্লেন' আকাশের বুক চিরি,
'ওয়েস্ট পেপার বাস্‌কেট' আমি গান্ধী-মার্কা বিড়ি,
আমি 'কে সি এন'* কত প্রেমিকের মান রাখি,
বাঙালি ছেলের 'নোটবই' আমি এক্‌জামিনের ফাঁকি।
আমি ভাদ্রের বান পৌষের শীত,
'ওরিয়েন্টাল আর্ট' আমি ; আমি কালোয়াতি গীত।
কচি শিশুদের কচি দাঁত আমি প্রৌঢ়া নারীর চুল,
আমি নন্দী, গায়ত্রী আমি ঘরের কোণের ঝুল
চতুরঙ্গের আমি জ্যাঠামহাশয়,
জগদীশ্বর মানিনেকো আমি করিনে কাহারে ভয়,
মেসের পেটেন্ট ইলিসের ঝোল পুঁইচচ্চড়ি আমি,
আমি বেহারী চাকর, সাবিত্রী ঝি, নই আমি রামী-বামী।

অর্থাৎ KCN কিম্বা Potassium Cyanide। আমরা যতদূর জানি Chemical formula এই প্রথম কবিতায় ব্যবহৃত হইল।

আমি প্রণয়ীর প্রণয়ের লিপি '*shell*' আমি 'ডিনামাইট'
ঘোর পুন্নাম নরক আমি যে, আলোমাঝে 'সার্চলাইট'
আমি ছুঁচ হয়ে হেথা সেথা ঢুকে ফাল হয়ে বাহিরাই
আমি হুঙ্কার করি প্রথমে কিন্তু শেষকালে চুমু খাই,
আমি গান গাই
গান গেয়ে-গেয়ে ছুটিয়া-ছুটিয়া চলি,
আমি চলিতে-চলিতে ঢলি—
বিঘ্ন-বিপদ শ্যাওলার মত পদতলে যাই দলি।
মাঝে মাঝে কভু পিছলিয়া পড়ি আমি,
প্রেমিকার প্রেম-পাশে ধরা পড়ে, চলিতে-চলিতে থামি,
আমি থামিতে-থামিতে ঘামি,
কবে 'বেহেস্তে' পঁহুছিব তাই ভাবি যে দিবস-যামি।
আমার কোমল নারীর প্রাণ
নিমিযে-নিমিযে পথে-ঘাটে-মাঠে
অকাতরে করি দান।
ওগো সুন্দরী
ওগো কিশোরী,
বেলা-শেষে ওগো অবেলায়,
কটাক্ষ তুমি হেনো মোর পানে
আমি মাতি নব ছায়ানট গানে
ফেলে হাঁড়ি মোর টাঙায়ে রাখিব শ্যাওড়া গাছের তলায়।
ওগো প্রেয়সী, করুণা কোরো,
আমার জটাপড়া চুল ছেঁটে দেবো তাই ধোরো,
তুমি থেকো গো 'আদুল' গায়,
আমি আপনারে টেনে-টেনে
'বহুত কোশিশ' মেনে
তোমারে লক্ষ্য করিয়া ছুটেছি ঠাই দিও ফাটা পায়।

রাজার হুকুমে পথে পথে তারা বেদনা ঢোঁড়ে

ব্যথার তাড়নে হতাশ তরুণ লিখিছে ছড়া
বেদনা খুঁজিয়া ঠুক্‌রিয়া ফিরে সারাটা ধরা।
গায়ে ওড়ে খড়ি, চোখে লোহু পানি—
ঘন-ঘন শ্বাসে ছেঁড়ে 'ছিনাখানি',

ব্যথা-ব্যথা শুধু, সারাটা দুনিয়া ব্যথায় ভরা!—
ব্যথার সায়র, শুধু মিলিল না কল্‌সি-দড়া।

মায়ে-বৌদিরে তাড়া দিয়ে খেয়ে উদর পুরে
ব্যথার 'ডিপো'য় চলেছেন কবি কলেজ ঘুরে।
দুনিয়ার যত ব্যথিতের দল—
মিলিয়া সেথায় করে কোলাহল,
কেহ ছড়া কাটে, কেহ গান গায় সুরে-বেসুরে ;
চায়ের পেয়ালা বিড়ি ও চুরুট কত যে ওড়ে!

ব্যথা-সম্রাট বসে রন সেথা কী সমারোহে!—
ব্যথাহত দলে ডাকিয়া সহসা কাতরে কহে,
"অলিতে-গলিতে যাও হে তোমরা—
দুনিয়ার যত ব্যথার ভোমরা,
সদরে গোপনে যত ব্যথা আছে চুষে এসো হে।
পতিতার ব্যথা, ব্যথা বিধবার পতি-বিরহে।

"পতির গেহেতে সতী বুকে কত বেদনা বহে,
অজানার প্রেমে কুমারী কত না বেদনা সহে,
দেখে এসো ব্যথা মুটেমজুরের—
কাছের বেদনা বিরহে দূরের,
মদের বোতলে ছিপি-আঁটা কত ব্যথা যে রহে,
লেখ কথা-গাথা, ডুব দিয়ে এসে অশ্রুদহে।"

রাজার হুকুমে পথে-পথে তারা বেদনা ঢোঁড়ে,
ভাত আগুলিয়া হেথা ঘরে মাতা মাথা যে খোঁড়ে!
বাতায়ন-আড়ে কাঁদে বিরহিণী—
ঘর ছেড়ে কোথা কাঁদিছে রোহিণী!
মজুরানী কোথা ছেলে ফেলে আছে বোতল ধরে,
পাটের কলেতে হয়েছে মজুর সিঁধেল চোরে!

শহরের শোকে হা-হুতাশ করে গাঁয়ের মাটি
প্রজার মাথায় পড়িছে কোথায় রাজার চাঁটি,
প্রেয়সী রমণী কোথা যেন কার—
ঘরে বাঁধা পড়ে করে সংসার।
কুলি-মজুরের ব্যথা দূর করে মদের ভাঁটি ;
সমাজ কোথায় আছে আগুলিয়া সুখের ঘাঁটি।

পথে যেতে-যেতে আনমনে ফিরে চাহিল ও কে,
পাহাড়-প্রমাণ ব্যথামাখা তার দুইটি চোখে।
মনে ভাবে কবি, চিনি বুঝি চিনি—
বুঝি ও-পাড়ার মুখি-গোয়ালিনী?
বেরাল কোথায় কেঁদে ফিরে যায় মাছের শোকে,
কার ভগিনীরে কে দিল কোথায় ফুলের 'বোকে'!

'নামহীন কামশিশু'রে জননী করে না মায়া—
পথের মজুর নাহি পায় হায় গাছের ছায়া।
বৌদি কোথায় দেবরে তাহার—
ভুলায় না দেহে তুলিয়া বাহার,
নিশা-শেষে কোথা গড়াগড়ি যায় তবলা-বাঁয়া,
কোন্ আলিসায় শুকায় কাহার ইজের-সায়া!

মাটি কেটে কোথা হয় পথ-ঘাট, পাটের কল,
কোথা সাঁকো-বাঁধা ব্যথায় কাঁদিছে নদীর জল!
পাড়ার ঝিয়েরা কে জানে কোথায়—
আধ-ধরা দিয়ে ছল করে যায়,
সারা দুনিয়ায় থৈ থৈ ব্যথা, নাহিকো তল!
ব্যথা দেখে-দেখে ফিরিল ব্যথিত কবির দল।

ক্ষুধার ব্যথায় নাড়ী চুঁই-চুঁই, কি করে কবি—
'ডিপো' তেয়াগিয়া ঘরে এল যেন ব্যথার ছবি।
'হায়-হায়, ছি-ছি, এ কি অবিচার'—
দুবেলা কবির চাই যে আহার,
কলেজের ফিস্, জুতা ও বস্ত্র, নাপিত-ধোবি,
আয়না-চিরুনি ট্রামের পয়সা চাহি যে সবি!

দাদা তাড়া দেয়, তাড়া দেয় মাতা, 'পারিনে আর'।
কবির বেদনা কেহ কি বোঝে না, কি অবিচার!
মিছে কি সমাজ-সংসার পিছে,
কবিরা সকলে আগুন জ্বালিছে?
মিছে কি লেখায়, 'বেদিয়া' সাজিয়া হানিছে মার?
বুকে কি বৃথাই বহিছে ধরার বেদনা-ভার।

ভাষা ও ছন্দ

যেদিন তিব্বত হতে নামি আসে অশ্বতর দল
পার্বত্য ভেড়ার লোমে কুব্জপৃষ্ঠ, চরণ বিকল,
অতিক্রমি সুদুর্গম গিরিশৃঙ্গ, কালিম্পং ধামে,
রংফুরে পশ্চাতে রাখি, ভুটান পাহাড়ে রাখি বামে,
একে একে দেখা দেয় উলের গুদাম সন্নিকটে,
অশ্বতর ক্ষুরাঘাতে ধূলিজাল গগনের পটে
যেমতি আবর্তি উঠে আঁধারিয়া দিক্‌চক্রবাল,
ধূলিসমাচ্ছন্ন গিরি ; মনে হয় যেন মহাকাল
তাণ্ডব করেছে শুরু, উমা-হারা হয়ে অকস্মাৎ
দক্ষালয়ে যজ্ঞভূমে ; সেই মতো কবি ভূতনাথ
উত্তপ্ত প্রভাত বেলা, পটলডাঙার পূর্ব মোড়ে
অশান্ত উদ্বেগভরে ভ্রমিছেন পীত লুঙ্গি পরে
নিতান্ত একাকী—একা ; বক্ষে তাঁর তরঙ্গ কল্লোল।
অদূরে মাধব চাকী বারান্দায় বাজাইয়া খোল
কীর্তন করেছে শুরু, কানে তাঁর পশে না আওয়াজ।
ঊর্ধ্বে জানালার চিক ফাঁক করি ত্যজি ভয়লাজ
পাড়ার কুমারী যত নিত্য অধ্যয়ন-অবসরে
তাঁহারে হেরিতেছিল। উপেক্ষি মদন পঞ্চশরে।
কবি ভ্রমিছেন খালি, ছন্দ তালময় পায়চারি
আবর্তিয়া মুখে-মুখে নবছন্দ নব সৃষ্টি তাঁরি,
উষার প্রাক্কালে অদ্য কণ্ঠে যাহা হৈল আবির্ভাব
নিতান্ত সহসা আসি, গাববৃক্ষে যথা ফলে গাব ;
তেমতি সে নবছন্দ ভারতীর লাউ-খোল ত্যজি'
স্বর্গ হতে মর্ত্যধামে উত্তরিল ; কভু পূর্ণগজী—
কভু-বা ইঞ্চেক মাত্র, ছন্দ সে নিতান্ত আধুনিক—
নাহি মাত্রা, নাহি যতি, মিলের নাহিকো কোনো ঠিক
নহেকো পয়ার তাহা ত্রিপদী কি চৌপদী তোটক,
নহে ভাষা প্রচলিত, ছন্দ ভাষা সম্রাট-জোটক!
ভাবে কবি, এ যে ছন্দ আবির্ভূত অকস্মাৎ আসি.
মার্জিত জিহ্বাগ্রে তাঁর, দিব্য দীপ্ত বিভা পরকাশি—
তারে লয়ে করিবে কি, অনাহুত আসার কি মানে,
কোথা হতে তোড়া তোড়া স্বর্ণমুদ্রা আকাশ-বিমানে
কে যেন আনিল বহি। বলা নাই কহা নাই কিছু,
ছন্দটি আসিল অগ্রে ভাষা এল তার পিছু-পিছু।

তাজ্জব ব্যাপার বটে, নিতান্তই জটিল ঘটনা!
এই ছন্দে কোন্ মহাকাব্য কবি করিবে রচনা
ভাবিয়া আকুল হল। ছন্দরূপী এ শিশু-ভোঁদড়
কোনো নীড় রচিবে কি, কণ্ঠ হতে দিবে কি ভোঁ দৌড়
পুন স্বর্গপানে ইহা, কবি হল ভাবিয়া আকুল।
ঊর্ধ্বে বাতায়ন হতে একটি টোপাল টোপাকুল
কে যেন বর্ষিল মাথে, খেয়াল নাহিকো কিছু তাঁর ;
বিধাতা যাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দেন ছন্দ-ভার
তার কি দেখিলে চলে কে কোথায় ভেংচাইছে তারে,
অথবা গোপনে বসি ভাসে কেবা নয়নাশ্রুধারে
তাহারে কামনা করি ; কাব্য যার শিরে করে ভর
কলেরা হয় না তার, নাহি হয় ম্যালেরিয়া জ্বর।
সে শুধু মিলের পরে পথে-ঘাটে মিল গেঁথে যায়,
মিল যার নাহি জোটে বীণাপাণি তাহারো উপায়
করিয়া দিলেন অদ্য, কবি পেল সেই ছন্দ নব
অকস্মাৎ প্রাতঃকালে উদ্ভাসিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তনভ
নবসূর্য হইল উদয়। রৌদ্র হল খরতর
বেথুনের বাস্‌টেন ফিরে গেল যুগ্ম অশ্ববর,
কবি তবু রহে আনমনে, কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি।
অফিসের বাবুকুল সহসা বাহিরে দেখে চাহি
তীর্থ-ধ্বাঙ্ক্ষবৎ কবি পাড়ায় আসিয়া দিল হানা,
তাহারা আফিসে গেলে যুবতীরা শুনিবে কি মানা,
কবিরে হেরিবেনাকো। হেরে যদি তা হলেই গোল,
ভাজি হবে পোড়া-পোড়া, স্বাদহীন হবে মৎস্য-ঝোল।
কবি তো একেলা চলে ক্ষিপ্ত শীর্ণ সারমেয় যথা
আনমনে ফেরে পথে, নয়নে ভাবের উজ্জ্বলতা।
বেলা বাজে দ্বিপ্রহর, ঝিয়েরা বাহির হল পথে
হস্তে অন্নথালা, আলু-বেগুন লুকায় কোনো মতে
বস্ত্র-অভ্যন্তরে সাধ্বী।

নবোদিত অরুণের মতো
হেনকালে সম্পাদক দেখা দিল, পদক্ষেপ শ্লথ,
দৃষ্টি ঊর্ধ্ব, তরঙ্গ-কল্লোল-চিহ্ন নবোদ্ভিন্ন টাকে,
ব্যথা-মনুমেন্ট যেন লভে গতি অজানার ডাকে
কবিরে নেহারি সেথা চমকিয়া পুছে সম্পাদক,
'শুনিনু পুঁটির মুখে স্বর্গ হতে নব ছন্দোদক

অবতীর্ণ স্কন্ধে তব, তারে লয়ে কি করিবে কবি,
কোন্ মর্ত্য-পাবলোভার, কোন্ স্বর্গ-উর্বশীর ছবি
বর্ণিয়া নূতন ছন্দে কাব্য-লোকে দিবে অমরতা?'

রাজপথে বিরাজিত দুপুরের প্রশান্ত স্তব্ধতা।
মধ্যাহ্ন-আহার শেষে পান খেয়ে ফেলিবারে পিক
আসি বাতায়ন-পাশে, যুবতীরা দেখে অনিমিখ—
এক ছিল দুই হল আসি।

ভাবোন্মত্ত কবিবর
শুনি সম্পাদক-কথা চক্ষে বহে অশ্রু ঝর-ঝর,
ম্লান হাসি কহে ধীরে, 'তুমিও এমন কথা কহ
আত্মভোলা সম্পাদক, হে তরুণ ব্যথা-বার্তাবহ,
উর্বশী-পাবলোভা-কথা অনুক্ষণ জপিছে সকলে ;
রবীন্দ্র উর্বশী লেখে, হের আজ তাহার নকলে
ছেয়ে গেল বঙ্গ-রঙ্গভূমি, পাবলোভা-বন্দনা-গীতি
সংস্কার বিমুগ্ধমনে অনুক্ষণ সঞ্চারিছে প্রীতি,
দেখনাকি এ-বঙ্গের বড় বড় শিল্পীকবিদল
মিথ্যার বন্দনা-গানে আপনারে করেছে বিকল।
রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা-কায়াহীন মানসীর পিছে
টো-টো করি ফেরে নিত্য, কেহ বসি টেবিলের নিচে
লাবণ্যের করে ধ্যান, সব যেন পুরুষত্বহীন।
বুঝিতেছি এ-সাহিত্যে আসিয়াছে ভীষণ দুর্দিন,
যেমতি মহিলা ছন্দ, তেমতি মহিলা ভাবভরা—
কবিদের কাব্য যেন ধার-করা স্বর্গের পসরা।
মর্ত্যের এ অপমানে শেষে দেখি তুমি যোগ দিলে।
রক্ত-মাংস-জয়-গানে সাথী নাই এ মর্ত্য-নিখিলে,
আমি একা—নিতান্ত একাকী। বিত্তের বন্দনাগান,
সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে আজোতক কাব্যে পায় স্থান—
নবাব-হারেম আর রাজ-অন্তঃপুর পরিপাটি,
ধনীর বিলাসকথা, কোথা আন্তরের কথা খাঁটি।
কে রচিবে গণকাব্য, পুরাতন ছন্দ-ভাব ত্যজি,
ফুটকি-ড্যাসে ভাঙা-ভাঙা, উপমার ভারে লজ্জাবতী
নূতন পুরুষ-ছন্দে শহরের গণিকার গাথা ;
কে হেরিবে কত রূপ ধাঙড়-কুমারী সদ্যস্নাতা
ধরে বরদেহে তার ; কে দেখেছে ঝাঁপ তুলি ধীরে
কাব্য কত প্রতিদিন সৃষ্টি হয় খোলার কুটিরে,

তেলকলে, পাটকলে ; কে গেয়েছে মজুরের জয় ;
গণতন্ত্র-ব্যাধি যত কেবা তার দিল পরিচয়
বেদনার অশ্রুজলে। কি মহৎ ব্যথার আবেশে
চৌর্যবৃত্তি করি চোর জেলে যায় শেষে ;
রহিমের পত্নী লয়ে হয় কেন গফুর উধাও ;
কাহার বদন স্মরি মাঝ-গাঙে মাঝি বাহে নাও ;
সে কোন্ জেলের বধূ টেড়িকাটা কুমোর-কুমারে
ভাবিতে-ভাবিতে মনে স্বামী লাগি পান্তাভাত বাড়ে ;
হারান মোদক কেন খামারের আম গাছে বসি
মশার কামড় খায় ; তেলীদের বিধবা রূপসী
কোন্ পথে যায় ঘাটে, ঘাটে গিয়ে অনাবৃত দেহে,
কেয়ার ঝোপের আড়ে সচকিতে বুকঢালা স্নেহে
চায় কেন বার-বার—এ সকল মহাকাব্য কথা
কেহ আজো করেনি রচনা। উপাধি-ঐশ্বর্যরতা
ছিল বাণী এতকাল, উপযুক্ত ছন্দ আর ভাষা
নামিয়া আসেনি মর্ত্যে, মিটে নাই মর্ত্যের পিপাসা।
সে ছন্দ আসিল অদ্য, ভাষা পেল কবি-কণ্ঠে মম,
হে তরুণ সম্পাদক, হে নিষ্ঠুর অহো হো নির্মম,
তুমি কিনা বল মোরে উর্বশীর করিতে বন্দনা!
কি দোষ করিল সখা পটলিকা-ডালিম-চন্দনা!
সুমধুর গদ্যছন্দে প্রচারিবে মর্ত্যের মহিমা
এই স্থির করিয়াছি মনে, লঙ্ঘিয়া মাটির সীমা
স্বর্গপানে মোর ছন্দ না যাতে উঠিতে পারে
এ মর্ত্যের সুবিপুল মেদ-মজ্জা-রক্ত-অস্থিভারে,
করহ উপায় তার। মহাকাব্য করিব রচনা
মর্ত্যের নায়কে লয়ে, সে হবে না ভাবুক উন্মনা
দেহহীন কাব্য-ধোঁয়া। রক্তে-মাংসে গঠিত মানুষ,
মিথ্যাভাবলোকে কভু উড়াবে না কল্পনা-ফানুষ,
হাসি পেলে হাসিবে সে, রাগ হলে চেলা কাঠ লয়ে
পত্নীর ফাটায়ে মাথা, নাস্তা খাবে আপন আলয়ে,
ও-পাড়ায় কদমেরে চোখে যদি লাগে তার ভালো
ধরিয়া করিবে সাঙ্গা, উচ্চকণ্ঠে কহিবে, নিকালো,
শখ মিটে গেলে তার—হে ভাবুক গুণী সম্পাদক,
কল্পনায় সরোবরে ওহে শুভ্র ধর্মরূপী বক।
মানস-বিমানে চড়ি এ নিখিল ভ্রমিয়াছ তুমি,

সহস্র নারীরে সখা, বাজায়েছ যেন ঝুমঝুমি,
দেখেছ মর্ত্যের লীলা, তুমি মোরে করহ নির্দেশ,
কাহারে নায়ক করি নবার্জিত এ-ছন্দে সরেশ
রচিব মহান কাব্য। কারে দিব সে মহা সম্মান?
সম্পাদক কহে ধীরে, 'কলাবাগানের বাবুজান।'

'জানি আমি জানি তাঁরে শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা,'
কহিলেন কবি, 'তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর, সে মহিমা রচিব কেমনে?
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগিতেছে মনে।'
সম্পাদক কহে হাসি, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
কলাবাগানের চেয়ে সত্য কবি তব মনোভূমি।
বস্তি-কথা রচিলেই কাব্য তব হইবে বাস্তব।'

চলি গেলা সম্পাদক। সম্মুখে উঠিল কলরব,
স্কুলের হইল ছুটি, কৌতূহলী বালকের দল
কবিমুখে স্বপ্নাবেশ নেহারিয়া করে কোলাহল,
বাতায়ন-অন্তরালে যুবতীরা করে হাসাহাসি,
"আ মর্, মিন্‌সে যে হেতা এখনো দাঁড়িয়ে উপবাসী,
হন্যে কুকুরের মতো, ঝেঁটা মার ঝেঁটা মার মুখে।"
প্রণমিয়া তাঁহাদেরে, মৃদু হাসি ভাবোদ্বেল বুকে
কবি ফিরে এসে 'মেসে' বসিলেন স্তব্ধ ধ্যানাসনে ;
সহসা লেখনী কাঁপে রবীন্দ্রের, উত্তর-অয়ণে!

পুরস্কার

ছিন্ন শাড়ির পাড়
পড়েছিল শবাকার
বাঙলার ইবসেন
হাওয়া খেতে চলেছেন
লাল পাঞ্জাবি গায়ে
ভোরের স্নিগ্ধ বায়ে
গায়ে খড়ি, চুল কটা,
তখন প্রভাত নটা ;

প্রাণহীন নিঃসাড়,
পটলডাঙার মোড়ে ;—
কবি শিহরণ সেন
অভ্যাস-মত ভোরে।
সবুজ স্টকিং পায়ে,
উড়িছে চাদর নীল—
আঙুলে আংটি ছটা,
টুঁড়ি কবিতার মিল

শব্দারণ্য মাঝে অতি অপরূপ সাজে
চলেছেন কবি, লাজে লাজিছে কিশোরী যত
পাড়ার ;—জানালা-আড়ে কবিরে নেহারি ঠারে
নিজ পতি-দেবতারে নিন্দিল কত মত!
ঊর্ধ্বে চাহিয়া কবি চলেছে যেন ছবি
ভারতীয়, মরু গবি যেন সেই পথখানি ;
বিশ্ব-ব্যথার গানে খিল ধরে আসে প্রাণে,
সঘন চুরুট টানে চোখে বাহিরায় পানি।
মিল খুঁজে ভাবাকুল আঁখিদুটি ঢুলুঢুল
খাড়া হয়ে ওঠে চুল ভাব-বিদ্যুৎ ছুঁয়ে।
দেহ-দীপশিখা-ভাগে বাসা বাঁধিয়াছে কাগে ;
বেদনা, বেহাগরাগে বাহিরায় চুঁয়ে চুঁয়ে—
"আমারে বেসেছে ভালো রোগা-মোটা সাদা-কালো
বিশ্বের যত আলো- করা কামিনীর কুল,
স্বপনে খেয়েছে চুমা কত রাধা কত উমা,
মিলেছে প্রেমের ভুমা, পীরিতি-বারিধিকূল ;
থমকি, চমকি চায়— পথে গড়াগড়ি যায়,
ভাঙা হুঁকাটির প্রায় ছিন্ন শাড়ির পাড়।
যেন হংসের ছানা ফুটা ফুস্‌ফুসখানা,
কাটিয়া বানাল 'খানা' ; যেন পাঁজরার হাড়
ধুলায় রয়েছে পড়ে, পটলডাঙার মোড়ে ;
এল কি শরৎ-ভোরে শ্রাবণ-মেঘের কালো!
হায় বিধি নিদারুণ, ভাব-গালে কালিচুন—
দিলে কেন? ডাহা খুন এর চেয়ে ছিল ভালো।
অতীব যতন মানি হাতে তুলে পাড়খানি
বক্ষে লইল টানি— নিখিল-ব্যথার কবি।
নয়নে বন্যা বহে, ডুবিয়া কাব্য-দহে
কবি মনে-মনে কহে— "ব্যথা-ব্যথা-ব্যথা সবি!
ধিক্ নিষ্ঠুরা নারী যার ছিল এই শাড়ি—
আজ ফেলিয়াছে ছাড়ি, শত টুক্‌রায় ছিঁড়ে ;
সলিতা পাকায়ে হায়, পোড়াল দীপশিখায়
ছাঁকিল চা পেয়ালায়, অথবা পাকাল বিঁড়ে ;
সেলাই করেছে ছুঁচে, ন্যাতা করে ঘর মুছে
ফেলিয়াছে নাহি পুছে, হায়রে নারীর মন!
অথচ সে একদিন এই শাড়ি ফিন্‌-ফিন্

আছিল অঙ্গে লীন ;
ছিল এরি অঞ্চল!—
ভরপুর ছল-ছল
ব্যথিত যখন হিয়া
আঁখিজল মুছি নিয়া
ভয়-কম্পিত-মনে
যখন সংগোপনে
বাঞ্ছিতজনে কেহ,
ভুলিত পতির গেহ,
তখন খেলিত নাকি?
নিমেষ ভুলিয়া আঁখি
আঁচলে চাবির ছড়া—
বার-দরজার কড়া
অফিস-ফেরত স্বামী
চকিতে নিচেতে নামি
শেষে যবে নিরুপায়
দূরে ওই চমকায়
ব্যথিত প্রেমিকজন
শোনা যাবে ঝন্‌ঝন্‌
বঁধু ফেরে তাকে-তাকে,
ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে
শাড়ি মেলিবার ছলে
অধীর বক্ষতলে
টুটিত ঘোম্‌টা-পাশ
একটু দীর্ঘশ্বাস—
শুধু আঁখি-কোণ দিয়া
দূর হতে 'প্রিয়-প্রিয়া'
শাড়ি হত সহকারী
হইত বিধুরা নারী
সেই শাড়িখানি কি না
পড়ে আছে গীতহীনা
হায় নারী নিরদয়া
কিম্বা পরেছ নয়া—
ধিক্‌ তোমা শতবার
টুটিবে অহঙ্কার

বক্ষের আবরণ
যবে হৃদি চঞ্চল
প্রণয়-পীড়ন-সুখে।
এরি খুঁটখানি দিয়া
কাঁদিত মনের দুখে।
বাতায়নে নিরজনে,
হেরিত ঘোম্‌টা-আড়ে
কাঁপিত সে তনুদেহ
বিদ্যুৎ পাড়ে-পাড়ে
তখন কি থাকি-থাকি
চাহিত না অনিমিখ!
ভুলে যেত নাড়াচড়া
করিত কি তারে দিক্‌!
বাহিরে উঠিত ঘামি
খুলিয়া দিত কি দ্বার!
সরে যেত নারী হায়!
শাড়ির একটু পাড় ;
খুঁজিত শুভক্ষণ—
আঁচলের চাবি বাজে—
বধূ-আঁখি খোঁজে তাকে
দিনের নিত্য কাজে।
ছাতে যবে নারী চলে
নাচিত শোণিত-ধারা—
খুলিত বক্ষবাস,
হায়-হায় গৃহ-কারা!
মিলিত যুগল-হিয়া
চোখে চোখে দূর-ভোগে—
ছাতেতে গোপন-চারী
মনে-মনে মনোযোগ।
ছিন্নতন্ত্রী বীণা
পথের ধুলায় আজি!
প্রেম কি লভেছে গয়া?
শাড়ি নব-সাজে সাজি।
দিনু অভিশাপ-ভার,
এই ছেঁড়া শাড়ি সম

মিলাবে রূপের রাশি　　হবে সুরহীন বাঁশি
তখন রবে না হাসি　　ওগো নারী নিরমম!"
এতেক কহিয়া কবি　　শাড়ির পরশ লভি
দাঁড়াইল যেন ছবি　　নির্বাক অনিমেষ ;—
দূরে-কাছে বাতায়নে　　পাড়ার যুবতীজনে
হেরে প্রফুল্ল মনে　　কবির মোহন বেশ।
শুনি খিল-খিল হাসি　　মরমে লাগিল ফাঁসি
হৃদয়ে বাজিল বাঁশি　　ভুলিল শাড়ির পাড়—
আবেগে তাকাল যাই,　　মাথায় পড়িল ছাই,
বলে কবি, "ছিছি ভাই,　　এই কি পুরস্কার!"

আমি যে প্রথমতম

তাজা 'বয়লার',—কয়লাকুঠির ময়লা-গাদার ধারে,
গয়লাবধূর পয়লা সোয়ামী ফেরে কম্পাস ঘাড়ে।
বিশাই তাহার নাম—
যত বাড়ে বেলা, বোঝা ঠেলে-ঠেলে ছোটে ততো কালঘাম।
ফার্লঙ দূরে লঙ সাহেবের অব্‌লঙ বাঙলায়,
ধানী গয়লানী 'সানি' দানি ঘানী-বলদে পানি পিলায়।
পাশে হাসি হাসি বাঁশি-চাপ্‌রাশী কাশির ইসারা কবে,
কটক-চটকে ভুলিয়া কামিনী চলিল ফটক-পবে—
বিশাই দেখিল হায়,
পহেলি সহেলি 'বহেলি' তাহারে আনাবাড়ি পানে যায়।
মেঘল হইল দীঘল বদন মুঘল-চিত্রসম
দাঁড়ায়ে বিশাই—ভাবে, দুলিয়ায় কে বুঝে বেদন মম?—
কহিল, "প্রেয়সী ধানী,
শীতল করুক শয্যা তোমার আমার চোখের পানি।
ধুধু মরুভূমি হেথায় আমার, ক্লান্ত পথিক চলি—
আমার বুকের সাহারা 'শ্যামাক্‌' তোমার বনস্থলী ;
নিরালা যাত্রা মম,
প্রিয়তম তব যে হবে হউক, আমি যে প্রথমতম।"

পুং-সতীনের স্মরণে কবি অনুপ্রাসরঞ্জন

(প্রিয়ার প্রতি)

যদি কোন দিন বেদানার মতো বেদনা জমাট বাঁধে,
বাদল আকাশ বাজায় মেঘের মাদল লইয়া কাঁধে—
বসিয়া তাহার কোলে,
আমার নামটি ভুল করে সখি তুলো গোলে-হরি-বোলে।

আমার দেশের গরম বাতাস যদি ঢুকে তব ঘরে—
বর-দেহে ওই ঘর্মের সাথে ঘামাচি সৃষ্টি করে,
বন্ধুর হয় পেলব তোমার দেহলতা কমনীয়—
আমারি দেওয়া সে সুড়সুড়ি ভেবে পিঠ তব চুলকিও।
শয্যায় শুয়ে প্রিয়া—
রেখো ব্যবধান তাতে ও তোমাতে পার্শ্বোপাধান দিয়া।
যদি কোন দিন ছাতে শুয়ে তব দাঁতের বেদনা জাগে,
আঁতের ব্যথায় আমিও ব্যথিত ভেবো সখি অনুরাগে।
ডাল রাঁধিবার কালে,
গালদুটি তব লাল কোরো সখি ভাবি বত্রিশ সালে।
গহনার লোভে যদি ভুলে যাও, ভুলো সেদিনের কথা—
শিল-নোড়া হাতে নারী ভোলে জানি সরিষার মনোব্যথা।
তাহারে বাসিও ভালো—
শুধু ভুলিও না খেয়েছি একদা তোমারই শটির পালো।

শীতলা

নহ দুর্গা, নহ কালী, পুরাণেতে বিশ্রুত-কাহিনী—
হে শীতলা গর্দভ-বাহিনী।
মর্ত্যে যবে গঙ্গা নামে নীলকণ্ঠ-জটাজুট ত্যজি,
কোথা ছিলে গুপ্ত, সতী, কোন্ সে দেবতারন্ধ্রে ভজি?
লজ্জানম্র, কম্প্রবক্ষ, ছিলে তুমি কিশোরী বালিকা—
পূজিতে পতির পদ ঘেঁটু-পুষ্পে রচিয়া মালিকা,
বসন্ত-পালিকা।
অস্ফুট কোরকসম ছিলে, হে কোপনে,
অতি সঙ্গোপনে।

যৌবনের সন্ধিক্ষণে, পতি-অঙ্গে উল্লাসে শায়িনী
ছিলে তুমি গর্দভ-বাহিনী।
পতি-গৃহে বধূবেশে গৃহ-কর্মে নিয়ত ব্যাপৃতা ;
লজ্জা, শঙ্কা, দ্বিধাময়ী ; কচিৎ হইলে অসম্বৃতা—
ভ্রূকুঞ্চনে, অভিমানে, রাগদ্বেষ নিমেষে ভুলিয়া,
চঞ্চল চরণে চলি চপলার চমক তুলিয়া
হেলিয়া-দুলিয়া—

আত্মহারা হতে পুনঃ সংসার-স্বপনে,
কল্পনা-বপনে।

যৌবন-সঞ্চারে হলে দ্যুলোকের হৃদয়-দাহিনী—
পূর্ণকায়া গর্দভ-বাহিনী!
বিদ্যুৎ-চমক তব বজ্রের গর্জনে হল হারা,
নয়নে-বচনে তব বরষিল হলাহল-ধারা,
শতমুখী হস্তে লয়ে জড়ায়ে অম্বর কটিদেশে,
ঝঞ্ঝার দাপটে তুমি ফিরিতে গো গৃহ-নটীবেশে—
আলুলিত কেশে।
ভীতি-মূর্তিমতী গৃহ-সমর-অঙ্গনে,
অয়ি বরাঙ্গনে।

ধীরে ধীরে স্বর্গে হয়ে নিদারুণ ভীতি-প্রদায়িনী—
হে সুন্দরী গর্দভ-বাহিনী!
মর্ত্যে হলে অবতীর্ণা আরোহিয়া গর্দভে সুন্দর—
দুর্ভাগা এ মর্ত্যজন-স্কন্ধে করি একান্ত নির্ভর ;
পতি প্রতি ক্রোধ যত নিঃশেষে বরষি নরশিরে—
কুষ্মাণ্ড-কদলী-দুগ্ধ-মিষ্টান্ন ও নবনীত ক্ষীরে
উদর তুষ্টি রে—
পরিত্যক্ত পতিগৃহে ফিরিতে বাসনা—
নাহি চন্দ্রাননা।

আজও কি মেটেনি ক্রোধ দ্বন্দ্বময়ী পয়স-পায়িনী,
হে অনন্ত বসন্ত-বাহিনী।
বর্ষে-বর্ষে কোপানলে দগ্ধ করি দীন মর্ত্যভূমি
গাত্রদাহ মেটেনি কি? তেমনি প্রচণ্ডা আজো তুমি?
মনসা-ওলার সাথে হে দেবী কি রবে চিরদিন,
দুগ্ধ-কলা-আতপ তণ্ডুলে হয়েছে কি দেহ পীন—
গতিশক্তিহীন।
বসন্তের বন্যা-স্রোত বর্ষ-বর্ষ ধরি
ঢালিবে সুন্দরী।

শিব, দুর্গা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কালী, কৃষ্ণে কভু তো চাহিনি
হে মোহিনী গর্দভ-বাহিনী,
যুগে-যুগে তব পদে সঁপিয়াছি পূজা-অর্ঘ্যভার,
সিন্দুর-মণ্ডিত খণ্ড-প্রস্তর দেখিলে শতবার

ভক্তি-ভরে নতি করি গৃহিণীর ভীতিনাশ-তরে,
দ্বিধা-শঙ্কা উঁকি মারে দীক্ষাজীর্ণ শিক্ষিত অন্তরে
ভয়-ভয় করে—
মুখে অস্বীকার করি পূজি সঙ্গোপনে
জান তো কোপনে।

স্তব-গান আর কারো হে সুন্দরী কভু তো গাহিনি-
ভীতিপ্রদা গর্দভ-বাহিনী।
বন্দি চরণারবিন্দ, বন্দি তব গর্দভ-বাহনে,
কৃপাদৃষ্টি করে মাগো দহিও না নয়ন দাহনে—
শিক্ষামদে মদমত্ত শিক্ষা দেহ যত অজ্ঞজনে,
মুছি দাও দুদিনের পুঁথি পড়া মোহের অঞ্জনে
নয়ন-রঞ্জনে।
তাবিজ-বন্ধনে আর পাদোদক দানে—
রাখ প্রাণে-প্রাণে।

প্যাঁচা

১

ওরে হুতোম ওরে আমার প্যাঁচা—
ভব সাঁঝেতে, শ্যাওড়া-ডালে,
প্রাণ খুলে তুই চ্যাঁচারে আজ চ্যাঁচা।
ড্যাব্‌রা চোখে মিটমিটিয়ে দেখে,
পোড়ো-বাড়ির ভাঙা আল্‌সে থেকে,
ঘরের কোণের কালি-ঝুলি মেখে
পুচ্ছটি তোর ঢুলের ভুলে নাচা।
আয় রে হুতোম আয় রে আমার প্যাঁচা।

২

দ্যাখ্‌না কোকিল খাঁচায়-পোরা ওরে,
আর তো কিছুই জানে না সে
ডাক্‌তে জানে খোনা-খোনা করে!
ওই যে বায়স কেবল করে কা-কা,
বঙ্গবীরের বাক্য যেন ফাঁকা
এক চোখেতে তাকায় বাঁকা-বাঁকা—

নস্ যে রে তুই ওদের মতন কাঁচা ;
পাকা রে তুই আয় রে হুতোম প্যাঁচা!

৩

গলা ছেড়ে ডাক ছাড়ে না কেউ,
যেন কিসের ভয় লেগেছে
পেছনে কি লাগল ওদের ফেউ।
সবাই ওরা ধর্‌ল চোস্ত বুলি,
আইন মাফিক হাঁকে মুখটি খুলি—
ভর্‌ল তাদের সকল ঝোলাঝুলি
চুরি-করা শব্দ নিয়ে বাছা।
Original হুতোম আমার চ্যাঁচা!

৪

তোরে হেথায় সবাই দেবে বাধা,
গলা ছেড়ে গাইবি যখন
নাক কুঁচ্‌কে বল্‌বে এল গাধা!
গাইবি হুতোম যা খুশি প্রাণ চায়
না কী ছেড়ে চ্যাঁচা জোর গলায় ;—
ন্যাকা-প্রেমের গান যাহারা গায়
ধরিস্‌নেকো দেখিস্ ওদের ধাঁচা।
আয় রে হুতোম আয় রে আমার প্যাঁচা।

৫

ডাক শুনে তোর যেন নিশুত রাতে
আঁতকে ওঠে পিলে সবার,
শিউরে ওঠে আঁধার বিছানাতে!
অলপ্পেয়ে তুই রে চিরকালের
পোড়োবাড়ির শুকনো শ্যাওড়া-ডালের,
আদ্যিকালের হুতোম, নস্ রে হালের
মানিক রে তুই অশুভ-সাগর-সেঁচা!
আয় রে হুতোম আয় রে আমার প্যাঁচা।

৬

প্রাণ আছে তোর আছে রে তোর গলা,
ন্যাকামি সব ঘুচিয়ে দে না
ভেঙে দে রে নক্‌লি ছলা-কলা!

মোলাম হয়ে গোলাম হল যারা
বাক্যি যেন মিষ্টি মধুর-পারা,
হেঁড়ে গলায় কর্‌ রে তাদের তাড়া
সাধা কানে মার্‌রে তাদের খোঁচা
আয় রে হুতোম আয় রে আমার প্যাঁচা॥

গদি

হে প্রাচীন গদি,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব তল—
ছারপোকা দলে দল
চলে নিরবধি।
কামড়ে শিহরে কায়া, মারিবারে যাই রুদ্রবেগে,
ছিদ্রহীন খাটিয়ার কোন্‌ ফাঁকে যায় যেন ভেগে,
চুপ করে বসি যবে, উঠে জেগে।
রহি-রহি তীব্রগন্ধ পশে নাসিকার রন্ধ্রপথে,
জমে-যাওয়া তুলারাশি হতে ;—
খাঁজে-খাঁজে উল্লাসে বিহরে—
থরে-থরে
ধাড়ি বাচ্ছা ডিম্ব যত
কর্বুরের মত।
হে তোষক, শয়ন-সঙ্গিনী,
হে তৈলাক্ত সুপ্রাচীন কৃষ্ণকায়া, হে তুলা-অঙ্গিনী—
গন্ধে ভরপুর।
ছারপোকা-শূর
তোমারে কি নিয়মিত দেয় ভাড়া?
সর্বনাশা প্রেমে তার মোরে তুমি কর শয্যাছাড়া
অসভ্য সে ব্যবহারে—
কে রহিতে পারে?
ঘন-ঘন মারে খোঁচা—ছাড়ে না অমনি,
শোণিত শোষণই—
একমাত্র লক্ষ্য তার, বিঁধিয়া আমূল
জ্বালাময়ী রক্ত-চোষা হুল—

করে যে আকুল—
অসহায় এই দীনহীনে,
চঞ্চল হইয়া উঠি তবুও বাঁচিনে।
দিবসের কর্ম অন্তে আসে ঢুল—
কত দেখি স্বপনের ভুল ;
মনোরথে
চড়ি, ধাই স্বর্ণময় পথে—
সহসা তখন তুমি দ্বার খুলে দাও—
মোরে নাহি চাও!
অমনি উধাও
যা-কিছু স্বপন মোর, জানি না কি পাও
ছারপোকা-দল হতে! নিঃশঙ্ক-নির্ভয়—
তারা, করে নয়ছয়
কামড়ে-কামড়ে মোরে, রক্ত শুষি করে দেহ ক্ষয়।

যে মুহূর্তে সচেতন, সে-মুহূর্তে কোথা কেহ নাই,
জাগি যাই—
পলায় সবাই!
সবারে লুকাও তুমি রন্ধ্র খুলি,
শয্যাসহচরে ভুলি,
সহিবে বল কে—
নিমক-হারামি তব পলকে-পলকে!
যদি তুমি মুহূর্তের তরে
যত্নভরে
মোরে চাহি, সখি,
জাগিয়া চমকি—
খুলিয়া ছিদ্রের মুখ দূরে করি দাও কোনো মতে
ছোট-বড় পুষ্ট-রুগ্ন কালো-সাদা
দুষ্ট ছারপোকা গাদা-গাদা
সবারে ঠেলিয়া দাও মোর দৃষ্টিপথে—
একে একে বিনাশিব আঙুলের ভারে,
নিব প্রতিশোধ হুহুঙ্কারে—
কাটি ফেলি শোণিত-শোষিণী হুলে
চড়াইয়া দিব মৃত্যুশূলে!

ওগো গদি, নিশাসহচরী—
ছার-পোকা অরি,

বুকে তব আপনারে নিত্য গুপ্ত করি
প্রতিদিন নেয় হরি
রক্তরূপ আমার জীবন—
ভয় হয়, কালাজ্বরে কবে ঘটে হঠাৎ মরণ।

ওরে গদি, মোরে আজ করেছে উতলা,
তব ছারপোকারাজি, শোণিত-চঞ্চলা
অলক্ষিত কামড়ের বিষময় জ্বালাময় জ্বালা।
খাঁজেতে-খাঁজেতে তব দুষ্টদের শুনি পদধ্বনি
দেহ মোর উঠে কনকনি ;
নাহি জানে কেউ
পশ্চাতে লেগেছে মোর লক্ষ-লক্ষ ফেউ।
বুকে জাগে বাঁচিবার ব্যাকুলতা ;
মনে আজি পড়ে সেই কথা
সদ্য যবে আসিলে চলিয়া—
শ্বশুরে ছলিয়া
নবরূপে,
বিবাহের যূপে,
ফুলশয্যা-দানে—
সেদিন প্রভাতে
দানের খাটিয়া সাথে
বদ্ধ হলে তুমি গদি, যেন প্রাণে-প্রাণে
কিসের সন্ধানে।

ওরে দেখ, ফের তারা হানিছে কামড়
আমারে করিছে জরজর।
তোমার সঞ্চয় থাক তোমারেই ঘিরে
চাহিব না ফিরে—
ফেলি তোরে টানি
সাথে লক্ষ প্রাণী—
রাজপথে,
শ্বশুরের দেওয়া খাট হতে
ওই আঁস্তাকুড়ে—জঞ্জাল-পর্বতে।

অকারণ

শুধু অকারণ কুলোকে—
কুৎসা আমার করে যে রটনা
পাঠায় আমারে চুলোতে।
যাহা মুখে আসে তাই বলে যায়,
সত্য-মিথ্যা কেহ না শুধায়—
নিন্দুকে বলে, শোনে যারা হায়
শুনে যায় মহা-পুলকে—
ধীরে-ধীরে দেখি রটিল কুৎসা
সকল দ্যুলোকে-ভূলোকে।

দুষ্ট লোকের কাহিনী।
চুরিও করি না করি না ডাকাতি
আড়চোখে কারে চাহিনি—
সুদ নিতে আমি নহি ছিনে জোঁক,
ভোগাও দিইনি কারো টাকা থোক,
রেস খেলাতেও নাহি মোর রোখ,
সূর্তি-সায়রে নাহিনি!
বাগান-বাড়িতে যাই নাই কভু—
নিয়ে মোসাহেব-বাহিনী।
উড়াইনি টাকা সুরাতে—
সাহেবের বাড়ি পাঠাইনি ভেট
ঝুটা টাইটেল কুড়াতে।
দেখেছ কি মোরে গলিতে-ঘুঁজিতে—
পালানো ঝিয়ের ঠিকানা খুঁজিতে—
নজর দিইনি কাহারো পুঁজিতে
নিজ গহ্বর পূরাতে।
দ্বিতীয় পক্ষে করেছি বিবাহ
প্রথমার আয়ু ফুরাতে।

মিছে মোর এই কাঁদনি—
অকারণে যারা করে গো নিন্দা
মানে না সাধ্যসাধনি।
ইষ্টদেবেরে রাখিয়া সমুখে,
বলি যদি আমি হাত দিয়ে বুকে,
কিম্বা সজোরে বলি তাল ঠুকে

তাতেও কি আছে বাঁচনি,
কে মানিবে আমি যাইনি সেদিন
কলপ কিনিতে চাঁদনী।

শুধু অকারণ কুলোকে—
মুখে যাহা আসে বলিতেছ তাই
হাঁদু, রাধু, কেলো-ভুলোতে—
রটে গো নিন্দা যদি অকারণ
পাজি সাজিবার কি আছে বারণ,
দুনিয়ার যাহা ধরণ-ধারণ
এড়াইতে পারে বল কে?
যা করে রটনা তাই যদি করি
থামিবে নিন্দা পলকে।

রাজহংস

আমি শুধু পেয়েছি জানিতে,
দিবসের খররৌদ্র অপরাহ্ণে ম্লান হয়ে আসে ;
সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে গুঁড়া-গুঁড়া হয়ে উড়ে যায়,
দাবদগ্ধ দিবসের ভস্ম-অবশেষ!
জানিয়াছি, তারপরে ধীরে নামে অন্তহীন নিশা,
গ্রাস করে চরাচর মুখহীন কবন্ধ-বিস্তারে।
অনন্ত নিঃসীম শূন্যে তম-শীর্ষ তরঙ্গের ঢেউ,
ফুলিয়া ফুঁসিয়া ওঠে, নিঃশব্দের বুকে দেয় হানা,
দিকে-দিকে লোলজিহ্ব তিমিরের চলে অভিযান।
তমসার কালো নীরে যত তারা-গ্রহ-উপগ্রহ
দোলে তরণীর মতো, প্রদীপের মিটি-মিটি আলো
তিমির-তরঙ্গাঘাতে কম্পমান ভয়ার্ত শিখায় ;
ভয় হয়, ক্ষণে-ক্ষণে কখন নিবিয়া বুঝি যায়!

কত যে নিবিয়া গেছে মহাকাল-বিপুল-প্রবাহে,
কত মানুষের প্রাণ, মানবের সন্ধ্যা ও দিবস,
কোটি-কোটি হল লয় বিন্দু-বিন্দু ধূলিকণারূপে
কাল-কালিন্দীর নীরে।
হয়ত হতেছে সৃষ্টি মহাকাল-কালিন্দী-সঙ্গমে
নবতর দ্বীপ কোনো ; ধূলিকণা সেথা গিয়া লাগে,
এক দুই লক্ষ-লক্ষ কোটি ও অর্বুদ ধূলিকণা।
এর মাঝে হায়-হায়, মোরা গণিতেছি গাঢ় স্নেহে
দিবসের খররৌদ্র অপরাহ্ণে হয়ে আসে ম্লান,
কখন জেগেছে উষা তিমিরের কালো উপকূলে,
খররৌদ্র জাগিয়াছে মধ্যাহ্নের তপন-প্রভায়—
আঁখিতে লেগেছে রঙ, দুই আঁখি ভরিয়াছে জলে,
ভালোবাসিয়াছি, আর বুকে কারে লইয়াছি টানি।

উড়িয়াছে রাজহংস মেঘাস্তৃত সুনীল আকাশে,
দুই পক্ষ বিস্তারিয়া শূন্যে করি স্থিতির নির্ভর—

গতির নির্ভর করি আকাশের লঘু বায়ুস্তরে,
কবে সে করেছে যাত্রা, ছাড়িয়াছে মাটির আশ্রয়,
কবে উত্তরিবে গিয়া তারো নাহি জানে সে ঠিকানা,
টলমল গাঢ়নীল হিমবক্ষ মানসের তীরে ;
উপলমুখর সেই মেঘচুম্বী পাহাড়ের কোলে
নীড়ের আশ্রয় তার।
সে-আশ্রয়ে নীড় আর শাবকের মাঝে
দিশাহীন নভোযাত্রা ক্ষণকাল রহে তার স্থির ;
বাহিরের স্থূল ডানা হয়ত ধূলায় মিশে যায়,
অন্তরের সূক্ষ্ম পক্ষ যুগে-যুগে চলে ঝাপটিয়া
শত-শত জন্ম-বিবর্তনে—
সেথা তার নাহিকো বিশ্রাম,
ক্লান্তি নাই, ক্ষোভ নাই তার।

ধরণীর রাজহংস আকাশের নীলাম্বু-বিস্তারে,
কত ক্ষুদ্র, গ্রহ-তারা-উপগ্রহমাঝে
আছে কি না আছে, জাগে অনন্ত সংশয়,
তবু সে একান্ত সত্য, সত্য তার গতির প্রবাহে ;
গ্রহতারা তার চেয়ে নহে সত্য বেশি,
অতি মিথ্যা ক্ষয়শীল বস্তুর প্রবাহ,
প্রাণহীন জ্যোতি।

ধরণীর রাজহংস জীবনের অনন্ত প্রতীক,
উড়িছে অনন্তকাল মহাকাল-আকাশ-সাগরে ;
নিম্নে কাল-কালিন্দীর তম-শীর্ষ তরঙ্গের ঢেউ,
ডাকিতেছে যুগে-যুগে ঝাঁপ দিতে সে তিমিরনীরে,
ধরিতে পারে না তারে, ঊর্ধ্বে তার বিরাট প্রয়াণ,
উচ্চে-নিচে চলে দুই গতির প্রবাহ,
চলিবে অনন্তকাল, মিশিবে না কভু একেবারে।
কোটি-কোটি গ্রহচন্দ্র কোটি তারা পাইবে বিলয়,
লক্ষ সৃষ্টি ধ্বংস হবে, জন্ম লবে সৃষ্টি নবতন।

কে জাগে?

শহরে সবাই ঘুমে অচেতন, জেগে আছে পেট্রোল,
বি-ও-সি এবং সোকোনি এবং শেল—
কারো আঁখি লাল, কারো চোখ দুধ-সাদা।

আর জেগে রয় রাস্তার মোড়ে বীটের পুলিস যত,
পৌষের শীত রাত্রি-দুপুর বাজে।

জেগে আছে যারা পানের দোকানে মদের বেসাতি করে,
বিড়ির দোকানে কোকেন যাহারা বেচে—
চাটের দোকানে প্লেটে সজ্জিত কাঁকড়া, ডিমের ঝাল,
গলদা চিংড়ি, বেসনে পলতা-ভাজা—
শীতের হাওয়ায় শুকায়ে হয়েছে কাঠ।

জেগে আছে তারা এখনও যাদের জোটে নাই খদ্দের,
জুটেছে যাদের—পাখা খুলে দিয়ে ভূতের নৃত্য করে—
মদে আর গানে, চাটে, বাঁয়া-তবলায়।
স্খলিত বচনে ঘন-ঘন তারা পান-ওয়ালারে ডাকে,
অকারণে চুমু খায়, হাসে, কাঁদে, গান গায় অকারণ।
বুদ্বুদ-সম কারেন্সি নোট হাওয়ায় মিলায়ে যায়।

জাগিয়া রয়েছে তাহাদের বধূ যাহারা ফেরেনি ঘরে,
মা-হতভাগিনী স্নেহময়ী কারো জাগে ;
রাত বাড়ে যত শুকাইছে বাড়া-ভাত,
সদর দরজা খুলে দিতে হবে, ঘুমে ঢুলে আসে আঁখি।
সরিষার তেল প্রলেপ করিয়া চোখে—
জাগে বধূ, তার জ্বালাধরা চোখ জলে ছলছল করে,
বুকের জ্বালার প্রলেপ, পাশের ঘুমানো খোকার ঠোঁটে।
ললাটে তোলে না হাত,
অদৃষ্টেরে ধিক্কার দিলে পাছে লাগে অভিশাপ।
ভাবে বসে আর যত্নে লাগায় তালি,
দুইটি মাত্র পরনের শাড়ি, ছিঁড়েছে ধোপার ঘরে।

যক্ষ্মার রোগী জাগিয়া কাশিছে বসে,
নয়নের জ্যোতি ঝাপসা হতেছে ক্রমে,
চারিদিকে যত মানুষ এবং ঘরবাড়ি-গাছপালা—
লাগে সুন্দরতর।
আঁকড়ি ধরিতে চাহিছে যখন, মুঠি খুলে খুলে যায়,
নিবে আসে ধীরে মলিন জীবন-বাতি।

তাহারই শিয়রে বসি,
ক্লান্ত প্রেয়সী তন্দ্রায় জেগে আছে,
জাগিবে যে কত দিন!

যত জাগে ততো সিঁথির সিঁদুর চওড়া ও গাঢ় করে—
হাতের নোয়ায় মনে হয় তার ঠিকরে হীরক-দ্যুতি।

জাগে কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে কাল যার আয়ু শেষ—

যে জন শোনেনি বহুকাল কানে, প্রিয়া ডাকে, "ওগো শোনো"-
সাধের কন্যা ডাকে, "শোনো-শোনো, বাবা।"
সহসা শিহরি মর্মের মাঝে ডাক শুনে জেগে আছে ;
কোথায় যেন রে বিনিদ্র ঘরে প্রিয়া ফেলে নিশ্বাস ;
ঘুমায়, তবুও খুকি ছট্‌ফট্ করে।
কম্বলে তার শুয়ে আধখানা, আধখানা গায়ে দিয়ে,
লাপ্‌সি ভুলিয়া আঁধার কক্ষে চেয়ে কড়ি-কাঠ-পানে,
জাগ্রত আঁখি ঝাপ্‌সা যাদের হয়—
তারাও জাগিয়া আছে ;
তারা প্রতীক্ষা করে—
প্রিয়া-বাহুপাশ একদা জড়াবে গলে,
সাধের কন্যা কণ্ঠ-লগ্না হবে,
আছে আশা, আশা মনে তবু কত আছে।

কাল যার আয়ু শেষ—
সে-জন জাগিয়া খোঁজে আকাশের তারা,
কঠিন পাষাণে বাধা পেয়ে চোখ, দেয়ালে কি যেন খোঁজে,
চটা উঠে গিয়ে এখানে-সেখানে ফুটে ওঠে কত ছবি,
কত চেনা মুখ, অচেনা ভঙ্গি কত ;
ভুলে-যাওয়া কোন্ বাল্য সখীর ঠিক যেন এলো খোঁপা।
কবন্ধ আর ছিন্নমস্তা-ছায়া
দেয়ালে-দেয়ালে জাগে—
চমকি জাগিলে মিলায় পলকপাতে।
মনে পড়ে যায়, পাশের বাড়ির মেয়ে
একদা আসিয়া বলেছিল কবে, ভেঙে গেছে পেন্সিল,
কেড়ে দিতে হবে ;—সকাতর অনুরোধ।
ধমকিয়া তারে বলেছিল, নাহি হবে।
যে-বেদনা-ছায়া নেমেছিল কালো চোখে,
সেই স্মৃতিখানি কেন তার মনে আসে
কাল যার আয়ু শেষ।
মার আঁখিজল নহে,
কবে কোথা দ্রুত সাইকেলে যেতে, নেহাত অসাবধানে—

চাপা পড়েছিল একটি কুকুরছানা—
তাহারই আর্তনাদ।

জাগে পাগলিনী, পাগলা-গারদে গরাদে রাখিয়া হাত,
ঘুম নাই তার চোখে,
মুখে হাসি ঘন-কান্নার মত ঠেকে,
পরনে জীর্ণবাস।
একে-একে তার সন্তান যত মরিল কালের ঘায়ে,
জাগ্রত মহাকাল।
তাহাদেরই পথ চেয়ে জেগে আছে, জননী উন্মাদিনী-
অন্ধকারের চরণ-শব্দ শোনে নিবিষ্ট মনে,
হঠাৎ হাসিয়া উঠে ;
হঠাৎ আর্তনাদে—
স্তব্ধ নিশার নিবিড় শান্তি ক্ষণ-বিঘ্নিত করি,
ডাকে, আয় বাছা, হাঁটি-হাঁটি পায়-পায়!
প্রসারিত বাহু ব্যর্থ শীতল হয়,
স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিয়া-ক্ষরিয়া পড়ে—
ফোঁটা-ফোঁটা দুধ কারার ধুলায় পড়ে টপ্-টপ্ করি,
যুগান্তরের সঞ্চিত কালো ধুলা—
সৃষ্টি শিহরি উঠে—
কাঁদে গতি-বন্যায়!

জাগিয়া রয়েছে কবি,
গগনে-গগনে অনাহত ধ্বনি, ধ্বনি মঙ্গলময়,
মলিন যা কিছু, যা কিছু অকল্যাণ—
সবারে ঢাকিয়া সেই সুর যেন নিখিল ছাপিয়া উঠে,
নয়ন ভাসিয়া যায়।

আর জাগে ভগবান,
জাগে নির্গুণ, পরম ব্রহ্ম, জাগেন নির্বিকার,
ফুল হতে ফল, ফল হতে বীজ, বীজ হতে অঙ্কুর—
অঙ্কুর মেলে পাতা, সেই পাতা শুকায়ে ঝরিয়া পড়ে,
তারে তিনি দেন কোল!
জাগে অশক্ত সর্বশক্তিমান—
জাগ্রত ভগবান।

শুধু হাসে মহাকাল—
হাহা সেই হাসি শুনিলাম যেন রজনী দ্বিপ্রহরে,

শীতের রাত্রি, মরা জ্যোৎস্নায় কুয়াসা গলিয়া পড়ে—
জনহীন রসারোড—
চলে চারিজন ক্লান্ত চরণে, ক্ষণে বদলিয়া কাঁধ—
মুখ আতি ক্ষীণ—বল-হরি-হরিবোল।
মহাকাল যেন হাসিল অট্টহাসে।
সে ক্রূর হাসিরে উপহাস করি আলোকিত দোতলায়—
নবজাত শিশু ককিয়ে কাঁদিয়া উঠে—
সেই জাগে চিরকাল।

কালকূট

পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।
বিলাসের কণ্ঠলগ্ন হয়ে, কলুষিত হয়েছে যাহারা ;
লোভে-ক্ষোভে জিহ্বা-মুখে যাহাদের ঝরিছে নিয়ত
দূর হতে লালাস্রাবী প্রেম,
লোলুপ ছেলের মতো জীবনেরে ভালোবাসে যারা,
জীবনেরে ভালোবাসে, ভালোবাসে আর করে ভয়—
দু-কথা তাদেরে কহি, পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।

রৌদ্র নাহি ভালোবাসে, মাথার উপরে ঘোরে পাখা,
কেঁদে যায় আকাশের হাওয়া ;
ছবির মেঘের বুকে দেখে তারা সিনেমার চাঁদ—
স্টুডিও উইয়ের ঢিবি হিমালয়ে করিছে আঁধার।
জলপূর্ণ কাচপাত্রে তাহাদের নীলাম্বু-বিস্তার—
উঠানের টবে হেরে বারিধির উন্মত্ত নর্তন ;
সাগরে জলের ঢেউ আছাড়িয়া তটেরে কাঁদায়।

বালুময় বেলাভূমে ছাতার আড়ালে রহে তারা,
সেথাও ড্রইংরুম প্রেম।
তাদের বসন্ত আসে, ঝরে না গাছের মরা-পাতা,
রঙে সাজে কাগজের ফুল,
নিখুঁত জ্যামিতি-কথা 'বেডে' ফোটে ফুল মরসুমী—
অপরূপ নাম তাহাদের ;
সে নাম যাহারা শোনে, মালীরে ধুলার দিয়ে দাম,
তাহাদের কানে-কানে শোনাব মৃত্যুর শতনাম।

দশ ধাপ সিঁড়ি উঠে, বেঞ্চ-পাতা 'হলে' যাহাদের
নির্লিঙ্গ দেবতা শোনে চোখ বুজে অর্গ্যানে কোরাস্
ততো ধর্ম যত ওঠে হাই,
চর্মের ভ্যানিটি-ব্যাগে দর্পণেতে দেবতার ছায়া,
আমি সেই দেবতার দেখিয়াছি মৃত্যুর স্বরূপ—
ধূলি-বালি-কর্দম-কঙ্কর ;
মর্মর-বেদির 'পরে দেখিয়াছি হাসিছে করোটি—
দেবতা মৃত্যুর পাত্রে পান করে জীবন-আসব,
পান করে, হাসে খলখল।
পমেটম-ক্রিম-ঢাকা চর্মে হায়, লাগে না শিহর,
কর্ণে নাহি পশে অট্টহাসি!
ধর্মের মন্দির-গর্ভে চিতাধূম দেখিয়াছি আমি—
প্রেমের বেদিকামূলে লেলিহান মৃত্যুর রসনা—
মহাকাল-করাল-ভ্রূকুটি।
মায়া-মোহ-যবনিকা ধীরে-ধীরে করি উত্তোলন
জীবনের রঙ্গমঞ্চে দেখাব মৃত্যুর অভিনয়—
মৃত্যুরে করিয়া নমস্কার।

স্বার্থের উদ্দাম লীলা, লালসার উলঙ্গ মত্ততা
প্রেমের মুখোস পরি কি বীভৎস কামের কলুষ
সন্তান গড়িয়া তোলে অর্থলোভী আয়ার সাধনা,
ক্লীব স্বামী ঔদার্যের ছলে,
পত্নীরে তুলিয়া দিয়া পরের মোটরে
পর-অর্থে চালায় সংসার!

সংসার!
ঝড়ো হাওয়া আকাশে-আকাশে—
ধূলিবালি ওঠে আবর্তিয়া,
শাখাচ্যুত শুষ্ক পত্র শুষ্ক ফুল উড়িছে চৌদিকে,
ঝলসিছে শ্যাম-কিশলয়।
ফুলের সংসার আর গাছের সংসার—
মরিয়া ঝরিয়া পড়ে ফুরাইলে আয়ু,
মরে আর বাঁচে।
জরাগ্রস্ত বিকৃতেরে বাঁচাবার নাহিকো প্রয়াস,
পীতেরে সবুজ নাহি করে।

মানুষের ঘরে-ঘরে ফুলের বাগান—
মাঠে-মাঠে পথে-ঘাটে গৃহের প্রাঙ্গণে

মানুষের প্রতিবেশী গাছেরা বিকৃত হয়ে আসে,
স্বভাব বীভৎস হয় ক্রমে ;
শতদল হয় দলহীন—
মৃত্যু হয় নিতান্ত মরণ।
সে-মরণ-ভীত আমি, মৃত্যুরে জেনেছি মহীয়ান—
জানাইতে চাই সবে মূঢ় সেই মরণ-স্বরূপ।

শিশুর পীযূষ-স্তন্য চাটিতেছে দন্তহীন বৃদ্ধের রসনা,
যে মরিবে সে মারিছে যে বাঁচিবে তারে
গুরুভক্তি-পিতৃভক্তি বংশের সম্মান,
বিরূপ-বীভৎস হয়ে জীবনের রোধিয়াছে পথ।

একের লালসা—
অর্থবল, লোকবল, অসহায় দরিদ্রেরে অন্নদানবল,
পদ-প্রতিপত্তি আর ক্ষুধিতের উদরের ক্ষুধা,
দরিদ্রের স্ত্রীকন্যার বস্ত্র-অলঙ্কারে অভিরুচি,
মোটর-ব্যসন আর হোটেল-বিলাস—
সবকিছু মিলিয়াছে মিটাইতে একের লালসা
বহুরে বঞ্চিত করি।
এক-কাম-বহ্নি মাঝে বহু প্রেম দিতেছে আহুতি ;
দগ্ধ-প্রেম-ভস্মে জন্মে উদরের সামান্য সংস্থান।

রমণীর মাতৃত্বেরে দিকে-দিকে করিছে সংহার
পুরুষের বিকল পৌরুষ।
বক্ষে ক্ষীর আসিতে না পায়।
দেহ-বেচা অর্থে মাতা সন্তানের দুগ্ধ করে ক্রয়—
দেহ-জাত হায়রে সন্তান।

যুগযুগান্তর ধরি পৃথিবীর মানবের শিশু
কাঁদিছে মায়ের কোলে বসি—
মাতা অসহায়—
সাম্রাজ্য-ফ্যাক্টরি-মদ-আফিম-কোকেন,
তাড়িখানা, রেস্তোরাঁ, হোটেল,
পথে পণ্যরমণীর ক্ষুধার্ত ইঙ্গিত,
সভ্যতার রথচক্র ঘর্ঘরিয়া ছুটিছে উদ্দাম।
লোভী ছেলে ছুটে যায় পথে,
জননীর চোখের সম্মুখে

রথচক্রতলে তার ছিন্নভিন্ন দেহ,
রক্তস্রোতে কর্দমাক্ত ধূলি।
সে লোহিত ধূলিজালে দেবতার মহান প্রকাশ—
অপরূপ মৃত্যুর বৈভব।

সমস্ত পৃথিবীব্যাপী দেখিয়াছি মানুষের চোখে
লালসার পঙ্কিল ইঙ্গিত।
মানুষেরে যন্ত্ররূপ, মানুষেরে করিতে হনন—
সর্পরূপে-পশুরূপে পরস্পর চলে হানাহানি।
প্রভুত্ব দাসত্বে হানে, কদর্যতা হানে সুন্দরেরে—
বাহিরে মোহন আবরণ।
নাট্যালয়ে অভিনয়, সিনেমায় চলচ্চিত্র ছবি,
মানুষের টানিছে নিচে, টানে-টানে ঘোর উন্মাদনা—
অর্থ দিয়া করে বিষপান।
আঁকড়িয়া ধরিবারে প্রিয়, প্রিয়তর জীবনেরে
জীবন চুঁইয়া পড়ে মুঠিতল দিয়া,
মৃত্যু আসে নিঃশব্দ চরণ।

সে মৃত্যু আমার মৃত্যু নয়—
দিগন্ত ছাইয়া উড়ে আমার শিবের জটাজাল,
আকাশ আঁধার করে অঙ্গের বিভূতি।
ভূমিকম্প নহে তাহা, নহে গিরি-বিদারণ-রূপ—
সে তো পলকের লীলা, নটেশের এক পদপাত,
দিকে-দিকে থৈ-থৈ মৃত্যুর তাণ্ডব।
তার মাঝে জীবন-অঙ্কুর—
শাখা-পত্র-পুষ্প মেলে আলোকের পানে,
প্রলয়ে করে না ভয়, দাঁড়ায়ে মৃত্যুর মুখামুখি,
আপনি বাড়িয়া চলে আপন গৌরবে।

আমার মৃত্যুর মাঝে দধীচির নিজ অস্থিদান,
রাজা শিবি দেহ-মাংস অকাতরে করে নিবেদন
কপোত-শরণাগত লাগি।
ক্রুশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ মোর সে-মৃত্যু মহান—
অগ্নিদগ্ধ বীরাঙ্গনা রূপ,
মৃত্যুতীর্থ স্নানে ধায় বীরদল উত্তর মেরুতে,
হিংস্র শ্বাপদের মুখে অরণ্যে গহন,
সুনিশ্চিত সলিল-সমাধি।

জীবের কল্যাণ লাগি মোর মৃত্যু করে আবিষ্কার
নব-জীবরসায়ন,
অপরূপ যন্ত্র-উদ্ভাবনা, মৃত্যুকর স্পর্শি হাসিমুখে—
হাসিমুখে ঝাঁপ দেয় ঘোরতর সমর-অনলে
আর্ত পীড়িতের সেবা-কাজে।
বন্দীর বন্ধন,
মুক্তিকামী মৃত্যু মোর আপনার গলে লয় তুলি—
সে মৃত্যুরে করি নমস্কার।

দূর কর মোহ-আবরণ,
বৈশাখের উন্মাদ বাতাসে
ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক যুগান্তের কালো মায়াজাল,
হাসুক শ্যামল কিশলয়!
যে জীবন যুগে-যুগে মৃত্যুরে করিল উপহাস,
মৃত্যুরে করিল নমস্কার—
করিল না ভয়,
শ্মশানের ভস্মস্তূপে সে জীবন খুঁজিছে আলোক,
মাটি ফুঁড়ি উঠিবে আকাশে—
মৃত্যুর বন্দনা-গানে,
সে জীবনে বার বার জানাই প্রণতি।
মৃত্যুরে করিতে জয়, নির্ভয়ে করিতে হবে পান
জীবনের সেই কাল-কূট।

বজ্র-আশীর্বাদ

হান বজ্র, বজ্র হান, মেঘলোকবাসী হে বাসব,
বজ্র হান আমাদের শিরে।
দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতা-বিরোধী—
সুদুর্মদ অহঙ্কারে শূন্যপানে আস্ফালিয়া বাহু,
মেঘলোকে তুলি শির উচ্চ কণ্ঠে কহিতেছি ডাকি—
ত্রিদিবের অধীশ্বর আমি আছি,—আর কেহ নাই,
সৃজিয়া নিখিল-বিশ্ব, সৃষ্টিধ্বংস করি আমি আপন খেয়ালে ;
জন্ম আর মৃত্যু এই জগতের সত্য ইতিহাস
আমিই রচনা করি।

ভোগ করি, করি ক্ষয়, অপচয়ে আনন্দ আমার—
অতীতে করি না নতি, ভবিষ্যের করি না সঞ্চয়,
যাহা আছে যাহা পাই মুঠি ভরি উড়াই ফুৎকারে,
অনন্ত কালের বক্ষে ক্ষণিকের বুদ্বুদ-বিলাস।

এর মাঝে তোমাদের কোথা স্থান, হে বাসব,
তোমরা অমরলোকবাসী—
নন্দনের পারিজাত-মাল্য শোভে গলে তোমাদের,
নিশিশেষে মালা না শুকায়—
নৃত্যরতা উর্বশীর নগ্নতা বীভৎস নাহি হয়।
স্খলে না চরণ তার, থামে না সে অশ্রুসিক্ত আঁখি,
কামনা-জড়িত কণ্ঠে তীব্র স্বরে ওঠে না ঝঙ্কারি।
তোমরা চাহিয়া থাক নিত্যকাল অপলক আঁখি,
ঘুমঘোরে নাহি পড় ঢুলে,
কাম-কণ্টকিত দেহে আছাড়ি পড় না কোনো অপ্সরা-চরণে,
ব্যর্থতার অশ্রু কভু গড়ায় না দুই চোখ বেয়ে।
কামহীন মৃত্যুহীন অবিরহী হে দেবতাকুল,
আমরা কাঁদিয়া মরি তোমাদের ভাগ্যহীনতায়—
আমাদের মাঝখানে তোমাদের কোথা দিব স্থান?

তোমরা ঊর্ধ্বেতে থাক, হে দেবতা নন্দননিবাসী—
ঊর্ধ্ব হতে আমাদেরে কর-কর বজ্র-আশীর্বাদ—
হান বজ্র আমাদের শিরে।
আমরা মরিতে চাই, মরিয়া বাঁচিতে চাই মোরা—
ধরার মৃত্তিকাবক্ষে পদচিহ্ন নিমিষে মিলায়—
অনন্ত অশেষ প্রেম তাও ধীরে শেষ হয়ে আসে।
ক্ষণকাল পূজা করি অতি ব্যর্থ স্মৃতির মন্দিরে
স্মৃতির শ্মশানভস্ম কালস্রোতে ফেলে দিই টানি।
মনে রাখি, ভুলে যাই, ভালোবাসি, ঘৃণা করি, পুনঃ
যাহারে ঠেলিয়া ফেলি তারি লাগি কাঁদিয়া ভাসাই।

আপনারে উৎসারিয়া আবরিয়া ফেলি এ নিখিল,
ভেঙেচুরে চলে যাই নিঃশঙ্ক গর্বান্ধ পদাঘাতে,
দলিয়া-পিষিয়া মারি নিজ হাতে আপনার জনে ;
নির্মম কুঠার হানি সম্মুখে রচিয়া চলি পথ,
পিছু ফিরে অকারণ খল-খল হাসি অট্টহাসি।

সবারে পশ্চাতে ফেলি দূরে গিয়ে ফেলি অশ্রুজল।
হতাশায় ভেঙে পড়ি, পথ ছেড়ে হই যে বৈরাগী ;
মনে হয় মিথ্যা সব, কিছুতে নাহিকো প্রয়োজন।
চোখে পুনঃ লাগে রঙ, ধরা পড়ি করি যে শিকার,
প্রিয়ে করি প্রিয়তর, প্রেয়সীরে প্রিয়তমা করি।
মদিরাবিহ্বল নেত্রে মধ্যরাত্রে পূজি বারাঙ্গনা,
শুচিস্নান করি প্রাতে দেবীর মন্দিরে দিই পূজা।

এও ক্ষণিকের খেলা, মৃত্যুর বধির অন্ধকারে
নিঃশব্দে ডুবিয়া যাই অলক্ষিতে সহসা একদা।
ঢেউয়ের পশ্চাতে ঢেউ, এক যায়, পুনঃ আর আসে,
শ্মশানের শুষ্ক চরে পলি পড়ে, ফসল গজায়—
পাষাণে জলের লেখা—মানুষের এই ইতিহাস।

শাশ্বত নন্দনে তব, হে বাসব, কে আছে দেবতা,
পড়ে পাষাণের লেখা, গোনে মর-জীবনের ঢেউ?
কেহ নাই, নিঃসঙ্কোচে হান-হান-হান বজ্রবাণ,
হান বজ্র আমাদের শিরে।
মরিতে করি না ভয়, যুগে-যুগে মরিয়াছি আমি—
আমার গগনস্পর্শী স্পর্দ্ধা কত মিশিল ধুলায়—
কত উর, বাবিলন, ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, কার্থেজ,
যুগে-যুগে কত জাতি জন্ম নিল, মরিল নিঃশেষে—
ফারাও, কাইসার কত, শার্লমেন, চেঙ্গিজ, তৈমুর—
পাষাণ-মর্মর-মূর্তি কারো আছে, কারো পড়ে ভেঙে,
স্মৃতি সে পাষাণ-ভার বিস্মৃতির প্রত্যন্ত সীমায়।

বাঁচিবারে চাহি নাই, বাঁচি নাই শামুকের খোলে,
শাখা ত্যজি ধরাপৃষ্ঠে নামিয়াছি মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষায়,
মেঘচুম্বী দেবলোকে মুহুর্মুহু হানিতে কুঠার
করেছি আকাশযাত্রা কামনার ডানা ঝাপটিয়া।
সাগরে ভাসাই তরী, ডুবিয়াছি গহন গভীরে
অতিকায় জলসর্প শুয়ে যেথা প্রবাল-শয্যায়।
মরুপথে অভিযান, ঘনারণ্যে শ্বাপদ-গুহায়,
মর্ত্যের মৃত্তিকা খুঁড়ি নন্দনের মাণিক্য-সন্ধান,
হিমালয়-শৈলচূড়ে মৃত্যুসাথে যুঝি বারম্বার—
তুষারেতে পদচিহ্ন মুছে যায় হিমমেরু-পথে।
বহ্নিরে করেছি বন্দী, অশনি শোনায় মোরে গান,
সে গানের অন্তরালে লক্ষ-লক্ষ মৃত মানবের

উঠিতেছে অবিরাম মৃত্যুঞ্জয়ী জয়োল্লাসধ্বনি।
তুমি কি শুনিতে পাও, হে বাসব, সে জয়-সঙ্গীত?
তোমারে উপেক্ষা করি মানবের এই অভিযান—
স্নেহচক্ষে দেখিয়াছ, অতিলুব্ধ মানব-সন্তানে,
আমারে করেছ ক্ষমা?

দেখিয়াছ, হে দেবতা, যুগে-যুগে কর আশীর্বাদ,
রূঢ় বজ্র হানিয়াছ বারম্বার মানবের শিরে—
আজো হানিতেছ তাহা, উর্ধ্বে থাকি প্রবল বিক্ষেপে,
হান বজ্র আমাদের শিরে।
স্পর্দ্ধা মোর ভাসায়েছ কতবার প্রলয়-প্লাবনে,
ফুঁসিয়া বাসুকী তব বারম্বার নাড়িয়াছে মাথা,
আমারে ঢাকিয়া গেছে লাভাস্রোত আগ্নেয়গিরির,
উত্তাল তরঙ্গাঘাতে কত তরী ডুবিল অতলে,
কত গৃহ উড়িল ঝঞ্ঝায়—
কত বজ্র হানিয়াছ যুগে-যুগে মহামারী রূপে!
কি তাতে হয়েছে ক্ষতি, হে বাসব? এরি মাঝখানে,
আমার প্রচণ্ড দম্ভ বারম্বার হাসে অট্টহাসি।
এরি মাঝখানে,
মহাযুদ্ধে বারম্বার আপনারে করেছি হনন—
মুহুর্মুহু গর্জিল কামান,
বিষবাষ্প ছড়াল চৌদিকে—
শ্যামল ধরণীবক্ষ করিয়াছি মৃতের শ্মশান।
আত্মঘাতী দম্ভে মোর, হে দেবতা, ওঠ না শিহরি?
কর না কি বজ্র-আশীর্বাদ—
তোমার প্রচণ্ড বজ্র পড়ে নাকি নিষ্ফল হুঙ্কারে
অসতর্ক-অসহায়-আবরণ-হীন এই মানুষের শিরে!
আর কত বজ্র আছে, হে বাসব, ওহে বজ্রপাণি,
কত অস্থি, কত দধীচির?
দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতা-বিরোধী—
তোমাদেরে করি না স্বীকার—
বজ্র হান, বজ্র হান শিরে,
বজ্র হান, হে বাসব।

দুই মেরু

আমার মনের এই দুই মেরু উত্তর-দক্ষিণ,
দুই হিম-মেরু নহে তুহিন-শীতল।
তুষার-আবৃত হিম উত্তর আমার,
ক্ষীণ রৌদ্রহীন আলোরেখা,
ক্ষণে-ক্ষণে উঠে ঝলসিয়া—
মৃতের অধরে ম্লান পাণ্ডুহাসি যেন।
প্রাণ যদি থাকে সেথা, টলমল থাকে যদি জল,
গাঢ় বরফের তলে গূঢ় হয়ে আছে—
হিম-মরু, হিম-আঁধি, বহে হিম-ঝড়।
নিশ্বাস নাকের কাছে জমাট বাঁধিয়া
ধোঁয়া হয়ে নয়ন ধাঁধায়।
আকাশে ওড়ে না পাখি, গাছ নাই, শাখায় কুলায়—
মেলিয়া আড়ষ্ট পাখা, হেঁটে চলে পেঙ্গুইনদল ;
বরফ-শীতল-জল আলোড়িয়া তিমি-সীল হিমের তিমিরে
দ্বিধায় লুকায়ে থাকে,
মাতালের মত টলে রোমশ ভালুক।

মনের উত্তর মেরু, আলো-অরোরার,
মৃত্যু নাই ; মৃত্যুহীন গাঢ় শীতলতা,
ছায়াহীন আলো।
কালের কুটিল গতি সেথা স্তব্ধ রয়।
মনের দক্ষিণ মেরু উত্তপ্ত ফুটিছে
রক্ত-রাঙা লাভা-স্রোত আগ্নেয়-গিরির।
মরে, পচে, পাকে চুল, শাখাপত্র খসি-খসি পড়ে—
ফুলের সুগন্ধে বায়ু ক্ষণেক মন্থর,
পূতিগন্ধ ক্ষণে-ক্ষণে নাকে আসি লাগে।
ভাল-মন্দ রমণীয়, বীভৎস বিকৃতি—
চলে কালস্রোত!

দক্ষিণ মেরুতে মোর বারিধি-গর্জন,
রৌদ্রকরে নীল জল উঠে ঝলকিয়া,
সামুদ্রিক লক্ষ জীব উত্তাল তরঙ্গে করে খেলা,
রৌদ্র-স্পর্শ দেহে মাখি তল-হীন অতলে তলায়।
ফেনারাশি নৃত্য করে ঢেউয়ের শিখরে,
আকাশেরে ছুঁইতে প্রয়াস,
বাতাসে ছোবল মারি রহি-রহি নিষ্ফল হুঙ্কার।

দক্ষিণ মেরুতে মোর পৃথিবীর সব নদী মেশে,
আবর্ত পঙ্কিল।
ভেসে আসে শব-দেহ, ভেসে আসে কাঠ-খড়-কুটা,
বিচিত্র ধরায় আসে মৃত্যু ও জীবন-পরিচয়,
আলো-অন্ধকারের সন্দেশ।
পথের বন্ধুরা আসে ঝড়ো হাওয়া, ডানা-ভাঙা পাখি,
ওড়ে চিল, ওড়ে মাছরাঙা ;
কানাকানি হাসি ও চিৎকার,
কখনও বৈঠকী গান, কভু একা একতারা সাধা।
দক্ষিণে যৌবন মোর, অর্থহীন উন্মত্ত প্রলাপ।
তপ্ত ভোগ তপ্ত কান্নাহাসি—
দিবস-রজনী আসে, লোভী বারবনিতার রূপে।
গূঢ়-ফণা-কামনার লেলিহান জিহ্বার বিস্তারে
মেরুর উত্তাল জলে অরণ্যের বিভীষিকা জাগে—
সুন্দর-কুৎসিত,
সব মিলি আমি অপরূপ।

উত্তর উত্তরে মোর, দক্ষিণে দক্ষিণ,
দোঁহে দোহাকার নাহি জানে পরিচয়—
দুই শুধু এক হল আমার অন্তরে ;
পরিচয়হীন ক্রোধে—
নিষ্ফল আক্রোশে দুয়ে এ উহারে হানে।
এই হানাহানি,
আমার অন্তর ব্যাপি নিরন্তর এ দ্বন্দ্ব-মন্থন,
বিষবাষ্প উঠে আবর্তিয়া,
কুৎসিতে সুন্দর করে, সুন্দরে ভীষণ।

উত্তরে-দক্ষিণে মিলি মোর আমি রয়েছে বাঁচিয়া,
অলক্ষিত দেবতার চরণে গোপনে লোটে মাথা,
সেই মাথা লাল হয় নিপীড়িতা রমণীর সিঁথির সিঁদুরে,
দরিদ্রে সর্বস্ব দিয়ে বঞ্চিতের সর্বস্ব কাড়ায়।

দক্ষিণে সবার আমি, উত্তরে আমার আমি একা,
পথেব বকুল-ছায়ে উত্তরেতে আমার সমাধি—
ফাল্গুনের উন্মন বাতাসে
শাখাচ্যুত ফুলদল পড়ে আসি শিয়রে আমার ;
অজ্ঞাত পথিক আসি ফেলে বেদনার অশ্রুজল—
আমার মৃত্যুর মৃত্যু সেখানে হয়েছে বহুদিন।

দক্ষিণেরে ভালোবাসি, উত্তর আমারে করে প্রেম,
সমাধি-শয়ন রচি মোর লাগি সে জাগে প্রহর,
দক্ষিণে আঁকড়ি লোভে আমিও অনন্তকাল ধরি
রচি উত্তরের ব্যবধান।
জানি না মৃত্যুর অন্ধকারে
উত্তর-দক্ষিণ মোর মিলে গিয়ে এক হবে কি না,
হয়ত প্রতীক্ষা তারই করি।

রবীন্দ্রনাথ

হিমালয়—
আপনার তেজে আপনি উৎসারিত,
আপনি বিরাট আপনি সমুজ্জ্বল,
শিখর, গুহা ও অরণ্য-সমাকুল,
যুগ-যুগ ধরি সঞ্চিত কত তমিস্রা অনাহত,
পুষ্পস্তবকে বিনম্র তরু, বিচিত্র কত ওষধি গন্ধময়,
ব্যাঘ্র-হস্তী-বরাহ বন্য, ভীষণ সরীসৃপ,
পুঞ্জিত কত মেঘলোক তার শিখরবিলম্বিত,
হিমালয় তবু হিমে ঢাকা, হায়, তুষারে অসাড় শির।
ভয় করি তায়, বিস্ময় মনে জাগে
মহিমা বিরাট, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত—
ভালোবাসিবারে যত যাই ততো সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
নিজ সাধনায় প্রান্তর ত্যজি চুম্বিয়া নীলাকাশ,
অসীম শূন্যে হিমে ডাকি শির একেলা প্রহর যাপে,
আপনার প্রেমে তিলেতিলে হিম হয়েছে বুকের তাপ—
মাটির উপরে দাঁড়ায়ে রয়েছে, সে কথা গিয়েছে ভুলে।
অতল নিম্নে গুহা-অরণ্যে শ্বাপদ ভ্রমিয়া ফিরে,
সাপেরা চলিছে বুকে-পেটে করি ভর—
বিচিত্র কত নরনারী, আর পোষমানা পশু কত,
ঘোড়া ও কুকুর, ছাগল, ভেড়ার পাল,
তারই আশ্রয়ে রয়েছে তবুও তাহা হতে কত দূর!
ভয় করি আর শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত,
ভালোবাসিবারে যত যাই ততো সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
রৌদ্র-আলোকে তুষার-শিখর সাদা ধব-ধব করে—
নিম্নে গুহায় কুহেলি অন্ধকার ;
ঊর্ধ্ব শিখরে ধু ধু করে হিম-মরু,
নাহিক পাদপ, নাহি পল্লব-ছায়া—
নিচে অরণ্য, রৌদ্রকিবণ পশে না ছিদ্রপথে,
ঘননিবিষ্ট তরু ও গুল্ম মেলেছে অযুত বাহু—
নাহি মানুষের পায়ের চিহ্নে আঁকা ক্ষীণ পথরেখা,
সারা বনভূমি রবিকরলেশহীন।
দূর হতে আসি, হিমে ঢাকা শির চকিতে ঝলসি উঠে,
অনাদিকালের বৃদ্ধ যেন রে বসে আছে পাকা চুলে—
ঝলসে তুষার, যেন বৃদ্ধের হা-হা-হা অট্টহাসি ;
ব্যাকুল হৃদয় আজিও পেল না নরম মাটির ছোঁয়া—
তুষারাবরণে আহত হইয়া ফিরি—
ক্ষোভে কেঁদে ফেলি, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত,
ভালোবাসিবারে যত যাই ততো সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
চিনিতে চেয়েছি, বুকেতে চেয়েছি, ধরিতে চেয়েছি তারে,
আজিও তাহার পাই নাই পরিচয়।
হতাশ হইয়া বসেছি আমার গৃহ-অঙ্গন-ছায়ে—
সুমুখে আমার সব্জির ক্ষেত তাহারি আড়াল দিয়া
হিমালয় হতে ঝরনা নামিয়া উপল-চপল পায়ে
ঝিরিঝিরি আর কুলুকুলু রবে ছুটেছে গাঁয়ের মেয়ে।
কোথা হিমালয়, হিমেতে রয়েছে ঢাকা,
পাহাড় গলিয়া নৃত্যচপল এসেছে গাঁয়ের মেয়ে,
বিস্ময় মানি তারি পানে চেয়ে-চেয়ে
ঢেউ গনি আর শুনি কুলুকুলু রব,
ভুলি হিমালয়, ভালোবাসি নদীটিরে—
ততো ভালোবাসি যত কাছে যাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
তুমি হিমে ঢাকা থাক, নদীরে কোরো না হিম।
আমার কুটির-আঙিনা ছুঁইয়া তোমার চপল মেয়ে
সবুজ করিয়া যুগে-যুগে মোর ছোট সে সব্জি ক্ষেত
বহিয়া চলুক, তুমি থাক, নাহি থাক—
হিসাব তাহার আমি তো রাখিবনাকো ;

আমি ছুটিব না বিস্ময়ে-ভয়ে তোমার পরশ খুঁজি,
যুগে-যুগে আমি স্নান সমাপন করিব ও নদীজলে—
কোথায় উৎস, কোন্ সমুদ্রে লীন,
ইতিহাস তার যে পারে রাখুক লিখে—
নদীজলে আমি স্নান করি আর তরণী বাহিয়া চলি—
যত ভালোবাসি ততো কাছে পাই পুলকে ফিরিয়া আসি।

চেখভের ডার্লিং

অসম্ভবের করি না সাধনা, চাহি না নিত্যপ্রেম
ততোটুকু মোরে ভালোবাস তুমি, যতটুকু থাকি কাছে,
যত দূরে যাই ততোখানি যাও ভুলে।
জানি, বিদায়ের কালে
তোমার চোখের ছল-ছল-করা জলের অন্তরালে
লুকাইয়া আছে, থাকিবে লুকায়ে, তুমি না জানিতে পার-
প্রেমের পীড়ন হইতে তোমার মুক্তির হাসিখানি ;
উঠিবে শিহরি ভাবিতেও সেই কথা,
সেই হাসি তবু জাগিবে সত্য হয়ে।

যুগে-যুগে এই মাটির ধরণী সাধিয়াছে জনে-জনে,
করিয়াছে পূজা লাখো মন্বন্তরে
লক্ষ মনুরে, মনু-সন্তান লাখো লাখো মানবেরে ;
স্মৃতির বেদিতে অমর করিয়া পূজা করি বহুদিন
বিস্মৃতিজলে শেষে ফেলিয়াছে টানি।
চেখভের ডার্লিং—
পূজিতে একেরে একের পূজাই ভেবেছে সত্য বলি,
ভেবেছে তাহাই সত্য নিত্যকাল।
এক চলে গেছে, অপরে আসিয়া লইয়াছে তার পূজা,
একেরে ভুলিতে এক নিমেষেরও লাগেনি অধিক কাল,
কারো পূজা তার মাটির জীবনে হয়নি মিথ্যা কভু,
কারো স্মৃতি তার হয়নি মনের ভার—
প্রেমের এ ইতিহাস!

মাটির ধরার তুমিও দুলালী মেয়ে,
তুমিও মাটির মেয়ে—

এই ধরণীর মাটির রক্ত করিয়া অতিক্রম
পারো না হইতে পাথর-কন্যা শিবানী হৈমবতী!
জীবনে যে স্বামী, মৃত্যুতে তার ছাই-মাখা কাঁধে চড়ি
বিষ্ণুচক্রে খণ্ডে-খণ্ডে পড় নাই পীঠে-পীঠে।
এক হও নাই বহু—
বহুরে মিলায়ে এক করিতেছ দেহ-পাদপীঠতলে।
আমি সে বহুর এক—
দেহবেদি 'পরে চাপিয়া বসেছি নিত্যদেবতারূপে,
গুরু-গুরু বুকে বিসর্জনের শুনিতেছি জয়-ঢাক,
নূতন দেবতা আসিতেছে পায়ে-পায়ে
বিদায় আমার আসন্ন হল দেবী।
বিদায় আমার আসন্ন হল, ক্ষোভ নাহি করি তবু,
জেনেছি সত্য মাটির জগতে ক্ষণিকের ভালোবাসা ;
তোমরা মাটির মেয়ে—
এক বরষার প্রণয়-প্লাবনে পলি-পড়া বালুতটে
ফোটে যে কুসুম, আর বরষায় ভেসে যায় স্রোতোমুখে।
নূতন করিয়া পলিপড়া বালুচরে
ফোটে যে নূতন ফুল।

যে ফুল ফুটিবে তাহারি গন্ধে ভরিয়া উঠিছে দিক ;
স্রোতে-ভেসে-পড়া শুষ্ক ফুলের কাঁপিতেছে প্রাণমন,
নূতন ফুলেতে পুরানো দেবীর পূজা—
পেতেছি আভাস তার।
আভাস পেতেছি সে ফুলও শুকায়ে ভাসিয়া কালের স্রোতে
জমিবে আসিয়া মৃত কুসুমের ভিড়ে—
তারি অভিনন্দন!

তাই বলে তব প্রেম কি সত্য নয়?
না হয়, নিত্য নহে।
বিদায়-বেলার ছলছল জল ইঙ্গিতভরা চোখে
প্রেম-বেদনায় আসে নাই তব মর্ম মথিত করি?
তোমার ওষ্ঠপুটে
কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিছে না তব গূঢ় হৃদয়ের কথা?
পরম সত্য তাহা।
পরম সত্য—আজি নিশিশেষে সে কথা যাইবে ভুলি,
আকাশের তারা মুছে যায় যথা প্রভাতে অরুণোদয়ে—
মুছে যায় তবু একঠাঁই রয় স্থির।

প্রেয়সী, তোমার ক্ষণিকের এই প্রণয়ের ধূপধুমে
নিত্য হয়েছে প্রেম-দেবতার পূজা।
নেশা তো ছুটিয়া যায়,
তাই হবে নেশা যতখন থাকে নহেকো মিথ্যা কিছু।
বিদায়-বেলার আঁখিজল আর ছলছল ইঙ্গিত
করুক রচনা প্রেম-বাঁধনের মুক্তির ইতিহাস,
বিদায় হইলে শেষ।

আজি ক্ষণকাল ম্লান বিদায়ের ক্ষণে,
তোমার-আমার প্রেমবন্ধন উঠুক নিত্য হয়ে,
সত্য হউক ক্ষণিকের মায়াজাল।
আমি ভুল করে ভাবি—
তোমার অভাবে দিনিগুলি মোর থমকি দাঁড়াবে থামি,
আঁধার হইবে দিনের রৌদ্র মম।
তুমিও আবেগে বুকে এসে মোর, বল হাতদুটি ধরি,
আমি চলে গেলে চলিবে না তব দিন ;
শরীরে আমার বলিবে যত্ন নিতে,
রাত জেগে-জেগে কবিতা না যেন লিখি,
বেশি ঝাল যেন লোভে পড়ে নাহি খাই—
আরও সে অনেক কথা।
বলিতে-বলিতে চোখদুটি তব আসিবে আয়ত হয়ে,
উপচি পড়িবে জল,
আমিও তোমারে বুকে টেনে নিয়ে দুটো বেশি খাব চুমা।

তারপর তুমি আবছা দেখিবে, দাঁড়ায়ে নদীর পাড়ে,
জলের তাড়নে একগাছি খড় দূরে চলে যায় ভেসে,
ভেসে চলে যায় পাগল ঢেউয়ের মুখে ;
বাড়াইয়া গলা দেখিবে, দেখিবে ক্রমে
জলের রেখায় খড়ের রেখাটি লীন,
দেখিতে পাবে না আর।
দেখিতে পাবে না সে কথাও ভুলে দেখিবে আরেক-জনে
নদীস্রোত হতে মুখ ফিরাইবে যবে ;
আমারে ভাবিয়া তারে নিয়ে গিয়ে ঘরে
পরম সোহাগে জড়াবে বুকেতে তারে,
চেখভের ডার্লিং।

যুগে যুগে ধরা এই করিয়াছে, তোমরা মাটির মেয়ে,
ধান্য-সরিষা-আলুর ফসল ফলিছে মাটির বুকে,

ফলিছে আগাছা সুখে ;
মাটির রসেতে সমান সবুজ সবে।

পাথর-কন্যা সতীরে লইয়া কাঁধে
শিব শুধু ফেরে শ্মশানে-শ্মশানে নাচিয়া তাথৈ-থৈ,
ধরা টলে তার টলমল পদভরে।

তোমরা সহজ, নিজেদেরে নাহি চেন,
চেখভেরা শুধু তোমাদের চিনে গভীর করুণাভরে,
লিখে বেখে যায় কালের বক্ষে তোমাদের ইতিকথা।

বল-বল প্রিয়ে, হাসিকান্নায় গাঁথা বিদায়ের কথা,
কর লাখো অনুযোগ—
শুনিতে এসেছি, শুনিব তা ভালোবেসে ;
শুনিব, আমারে ভুলিবে না তুমি কাছ হতে দূরে গেলে
বুঝিব, ভুলিবে কালই।
তা বলিয়া বুকে টানিযা লইয়া ললাটে খাব না চুমা?
কান হতে তব সরায়ে-সবায়ে এলোমেলো চুলগুলি,
কপোলে কেন না বুলাইব হাতখানি?
বুলাইব হাত, ভাবিব নির্বিকারে,
আবও কতদিন থাকিবে না জানি চিঠি লিখিবাব পালা।

শ্মশান-বিলাসী শিব,
কাঁধ হতে মৃত সতীরে ফেলিয়া দাও।

পান্থ-পাদপ

মনটারে সাদা পরদা বানায়ে স্মৃতির আলোকে দেখি,
কত ছায়াছবি ভেসে ওঠে পরদায়—
মনের কবরে একটি-একটি চলিয়াছে শবাধার,
জীবনে তাহারা থাকে নাই বেশিদিন।
স্মৃতির এ শোভাযাত্রায় তারা বিলম্ব নাহি করে।
কারো সাথে কারো নাহি কোনো যোগ, শুধু চলে সারি-সারি-
আমারই খেয়ালে দ্রুত কি বিলম্বিত।
প্রখর রৌদ্রে মধ্যদিনের দাহে—
প্রভাতে যখন দিবসের কাজ শুরু,
সে স্মৃতি-খেলায় নাহি মোর অবকাশ।

রজনী যখন আঁধারিয়া আসে, গগনে ঘনায় কালো,
দূরে কোথা শুধু প্রহরী পেচক জাগে,
মেঘে-মেঘে যবে ধূসর আকাশ, আলো আব্‌ছায়া হয়,
অবিরল ধারে আকাশের ধারা ঝরে ;
একাকী আমার বাতায়নে বসি, মন-বাতায়নে সখী,
স্তব্ধ পুলকে দেখি চলিয়াছ সবে—
কারো চেনা শুধু সিঁথির সিঁদুর, কারো গুণ্ঠনখানি,
কারো চেনা শুধু কণ্ঠের কালো তিল,
শাড়ি পরিবার ভঙ্গিটি শুধু কারো লাগে চেনা-চেনা,
কেহ ধরা দাও পিছন ফিরিয়া চেয়ে—
পথে যেতে-যেতে ক্ষয়ে মুছে গেছে চরণে যাবক-রস,
চেয়ে-চেয়ে মোর ঝাপসা যে হয় আঁখি।

এক

সবে চলে যায়, তুমি শুধু সখী দাঁড়াও কি যেন ছলে,
তোমারে দেখেছি কাঞ্চন-নদী তীবে।
ফুলের ফসলে ভরা সাজিখানি ছিল না দখিন হাতে,
বাম হাতে নাহি ছিল লীলা-শতদল।
তুমি ছিলে আর ছিল বালুচর, মাছরাঙা উড়ে-উড়ে
খর-দৃষ্টিতে দেখে আর দেখে শিশু-মৎস্যের খেলা ;
ওপারের বন ঝাপসা হইয়া আসে।
কিছু মনে নাই, মনে আছে শুধু সীমাহীন পটভূমি,
সাঁকোর উপরে চলে আলোকিত ট্রেন।
তুমি আর আমি—তারপরে ছবি, নগরীর ধূলি-ধোঁয়া,
বালিগঞ্জের পথে ছুটে চলে ডজ-গাড়ি একখানা,
রঙিন শাড়ির বিজলি-ঝলক রেখা,
অতি সুমধুর কলহাস্যের ধ্বনি,
তার পরে মনে নাই।
তবু আজো সখী, কেন নাহি জানি রয়েছি প্রতীক্ষায়,
কিশোর মনের তুমিই প্রথম প্রেম।

দুই

গ্রীষ্মের ছুটি, অনেক দিনের কথা,
তখনো পাকিয়া ঝরে নাই কালো জাম,
করমচা পেকে হয় নাই ঘোর লাল,
কাঁচা আম আর লঙ্কা নুনের চলে বাদশাহী খানা।

তুমি ছিলে কাঁচা, আমারো তখন পাক ধবে নাই মনে,
দৃঢ় পাখা মেলি অসীম শূন্যে কবিনি বিহার শুরু।
অতি-পরিচিত অবজ্ঞা কেন হঠাৎ সেদিন সখী,
খব-দুপহরে হল অভাবিত প্রেম।
যে চোখে চেয়েছি, যে সুরে কয়েছি কথা—
একটি নিমেষে নূতন জন্মলাভ ,
চোখে লাগে ঘোব, কাঁপিতে লাগিল সুর,
পূর্ণিমা চাঁদ হল যেন আধখানা।
বন্ধ দুয়ার-বাতায়ন, শুয়ে পাশাপাশি দুইজনে,
ভীরু মন চাহে তখনই হইতে দেহের সীমানা পার—
তুমি ছিলে সখী, কিছুতে তোমার আপত্তি ছিলনাকো—
একূল-ওকূল মাঝগাঙ—যেন সকলি সমান তব,
ঘটিবে যা কিছু অস্বাভাবিক ঠেকিবে না তব কাছে।

অপটু অনভ্যস্ত প্রেমেব খেলা না হইতে শুরু,
কি জানি কি ভেবে চোখে চেয়ে মোর কহিলে সহজ ভাষে
আজ তুমি হেথা পাশে শুয়ে মোব, কোথায় থাকিবে কাল,
কোন্ খেয়াঘাটে কোন্ নদী হবে পার!
চমকিয়া উঠি, শয্যা ছাড়িয়া জানালা দিলাম খুলে,
অবাক হইয়া তুমি শুধু, সখী, চাহিলে আমাব পানে,
তপ্ত বাতাস ধূলি-কাঁকবের পসরা বহিয়া শিবে
ঘরে এল, ছেঁড়া কাগজপত্র করিল নাচন শুরু
সঙ্গীরা তব খেলা করে দূর কাঁঠাল গাছের তলে—
তাহাদের কলহাসি।

তারপরে তব সুকঠিন ব্যাধি, মৃত্যুর সাথে যুঝে
বন্দী তোমারে আনিনু মুক্ত করি ;
রোগ-পাণ্ডুর নয়নে তোমার ফুটিল প্রেমের আলো।
তারপরে তব বিবাহ—তোমারে নিয়ে গেল দূরদেশে,
মূর্ছাকাতর বাসন-শয়ন মিথ্যা হইল সখী।
তারপরে, ফিরে আসিলে উন্মাদিনী—
ক্রোড়ে শিশুচাঁদ, তবু নীলাকাশ দুলিছে ঝড়ের দোলে—
তারো পরে—কালো নিশা—
কেহ নাহি জানে তিমির প্রভাতে উদিবে কি শুকতারা।

তিন

একটি মাসের প্রবাস আমার, বহুদূরদেশে নয়,
পাশেরই বাড়িতে মাঝে গলি ব্যবধান ;

ছন্দে-ছন্দে যাঁর সাথে পরিচয়, যারে দেখিবার ছলে
অকারণে কত করিয়াছি আসা-যাওয়া—
এমনই ঘটিল যোগাযোগ, সেই বাড়িরই কক্ষে কোনো,
বিছায়ে শয়ন ঘুমেতে নয়ন মুদি।
মকরকেতন তোমারে ছুঁইয়া গেছে—
চোখে লেগে আছে তখনও পরশ তার।
বুকের বসন খনে-খনে খসি পড়ে,
দেহের কিনারে উঠে আর ভাঙে ঢেউ ;
চকিত হাসিতে কালো শঙ্কার ছায়া!
দু-বাহু বাড়ায়ে, তোমারে ধরিতে গিয়ে,
কঠিন শিলায় প্রতিহত হয়ে ফিরি,
বেশি ঘন ঠেকে রজনীর কালো চুল।

প্রভাত আলোয় মনে হল যেন স্নিগ্ধ পরশে কার
ঘুম ভেঙে গেল, অপরূপ অনুভূতি।
মনে হল, তুমি স্বপ্ন-সরণি পায়ে হেঁটে হলে পার।
দিনের আলোক প্রেম-অভিনয়ে ফেলে দিল যবনিকা,
রঙ্গমঞ্চে অবোধ শিশুর মত—
তুমি লীলাভরে তুলে ধর যবনিকা,
প্রেক্ষা-গৃহেতে আমি একা বসে, লেখা কি পড়ার ছলে
দেখি আর দেখি, লোভে-ক্ষোভে দেহ তপ্ত হইয়া ওঠে,
নয়ন মুদিয়া কভু থাকি শুয়ে প্রতীক্ষা-অবসাদে।

সন্ধ্যা-আঁধার যেমনই ঘনায় সখী,
তোমার প্রবেশ, প্রদীপ জ্বলিল ঘরে,
সভয়ে চকিতে শয্যা রচনা করিবার অবসরে
কভু ধরা দাও, কভু কহ, ছি ছি, ও কি!
ছোট ভাইঝিরে হঠাৎ কাছেতে ডাকি
মোর পানে চেয়ে হাস অকারণ দুষ্টামিভরা হাসি।
তোমারে কি ভালোবেসেছি, অথবা চেয়েছি তোমার দেহ,
কৈশোর নয়, যৌবন নয়, তুমি ছিলে মাঝামাঝি—
হরিণীর ভয় কখনো নয়নে, কভু শিকারীর ছল।

* * *

দ্রুত ধায় গাড়ি, পাশাপাশি থাকি বসে—
দুয়ে একা নই, আরো থাকে দলবল,

কখনো জানিয়া, কভু অজানিতে গায়ে-গায়ে ছোঁয়া লাগে,
পায়ে-পায়ে জাগে বিদ্যুৎ-শিহরণ ;
তাহার অধিক নহে।

তারপরে দূর, বহুদূরে সখী, সুগভীর বনভূমি,
পাহাড়ে ও বনে চোখে অবসাদ জাগে ;
সেথা তব বধূবেশ ;
গুণ্ঠন শিরে, চাহিছ ভুলিতে কবে কি ঘটেছে ভুল।
আমার মনের বনে—
একদা যে শাখী শাখা মেলেছিল, যদিও শুকায়ে গেছে—
দখিন বাতাসে আজিও তাহার মর্মর-ধ্বনি শুনি ;
যদি কভু দেখা হয়—
তোমার প্রণাম সহজে লইব, সখী।

চার

আশ্রয়হারা বনের হরিণী, রজনী তিমিরা অতি,
আশ্রয় নিল বাঘের দুয়ারে আসি।
লোলুপ ব্যাঘ্র কহে, এসো-এসো—তোমারি লাগিয়া আমি,
নিবিড় নিশার ব্যাকুল প্রহর যাপি।
রজনী-প্রভাতে দুইজনে মোরা এ বন-গহন ত্যজি
যাত্রা করিব অজানার অভিসারে।
দু-বাহু মেলিয়া ধরা দিল মৃগ, হারাইল আপনারে।
প্রাণের আবেগে তারপরে হায়, বাঘেরে খুঁজিতে গিয়ে
শোনে দূর বনে মৃগপ্রলুব্ধ ব্যাঘ্রের হুঙ্কার—
অরণ্যভূমি তাহার শিকারভূমি।
হায় সখী, তুমি সেদিন হইতে আজো প্রতীক্ষা কর,
যা গিয়েছে, কোনো শুভ গোধূলিতে পাবে না সার্থকতা,
যা দিয়েছ তার বিনিময়ে মোর আঁখির আবেশ হেরি,
ক্ষণিকের সেই মোহের ভ্রান্তি মম—
সারাটি জনম কাটিবে কি সখী, স্মৃতি-সৈকতে বসি,
ঘট ভরে কারা, তারি ঢেউ গুনে-গুনে!
তার চেয়ে ঝাঁপ দাও,
লক্ষ সাগর শোভিছে লক্ষ চঞ্চল নদীহারে—
হিমালয়ও নহে এক,
দেওয়ার দাবিতে চেয়ো না বাঘের মন।

পাঁচ

আলো করিয়াছ, ভালোবাস নাই সখী,
গান গাহিয়াছ, সে গান হয়েছে মিছে—
অপরে লুকায়ে পাওনা বুঝিয়া তার
উপরি পাওনা চেয়েছিলে মোর কাছে,
একূল-ওকূল দুকূল বজায়, এই তো অসতীপনা!
যে নদী সাগরে ধায়—
কূল সে ভাঙিয়া চলে, চাহে না তো পিছনে ফিবিয়া কভু,
দরজার পানে ঘন-ঘন নাহি চাহে,
প্রিয় এলে ছলে ঝিয়েরে বাজার করিতে পাঠায়নাকো—
তার চেয়ে তুমি আমারে কহিতে যদি,
তুমি দূরে যাও আমি আর পারিনাকো—
দূরে আসিতাম, ভালোবাসিতাম সখী,
কাঁদিতাম তব স্মৃতির বালাই নিয়া।
গাছেব খাইয়া, তলার কুড়ায়ে সই,
সতী থাকা যায়, হয় না পীরিতি করা।

ছয়

ভালোবাসি তব ভঙ্গিটি সখী, ভালোবাসিবার ভান,
পরকে ঠকায়ে নিজে ঠকিতেছ ভাবা।
কুন্দদন্তে অধর চাপিয়া, নয়নে চাপিয়া হাসি—
ভালোবাসি সখী, ভুয়ো ভর্ৎসনা তব।
প্রকৃতি তোমারে গড়িয়াছে কৌশলে,
দিতে শেখ নাই, নিতে শিখিয়াছ, নকল করুণাময়ী,
গত জনমের সাধনালব্ধ নয়ন-অশ্রু-জল।
জানি-শুনি-বুঝি তবু কেন ভুলে থাকি,
হায় পতঙ্গ, হায় পতঙ্গভুক্,
অগ্নি তো নও, আগুন হইলে নিবে যেতে এতদিন—
দাহিকা নহ তো, নিয়ত শোষণে কীটে জর্জর কর।
জর্জর হই তবু সখী, ভালোবাসি,
পাষাণী, তবুও পাষাণ-ভঙ্গি মন ভুলায়েছে মম।

সাত

কাছে গিয়েছিনু আপন গরজে সখী,
দূরে এসে আমি নিজেরে বাঁচাতে চাই,
মাঝখানে যাহা ঘটিল, সে নহে তটিনীর ইতিহাস।

পচা পাতা আর পচা ধুলা আর লুব্ধ ব্যাপারী যত,
বসেছে বাজার, বাজার করিতে গিয়ে,
এটা-ওটা কিনি, যতটুকু পারি কাদা বাঁচাইয়া চলি,
বাজার সারিয়া ঘরে এসে হাঁফ ছাড়ি।
মনেও পড়ে না কুমড়োউলীর নয়নে ক্ষুধিত ভাষা,
হিসাব-খাতায় লেখা আছে শুধু কত তারে দিনু দাম।
বাজারের ইতিহাস—
স্মরণ করি না ঘরের রান্নাঘরে।
তবু যবে রাত-দুপুর গড়ায়, শিয়রে নেবাই বাতি,
বাতায়ন-পথে দেখি আকাশের তারা,
দু-একটি ভালো কথা যা শুনেছি, বলেছ প্রেমের ভানে,
আধখানা সুর, ভাঙা সিকিখানা মন,
শতধা হইয়া ফেটে পড়া মিছা পোষা নয়নের জল—
উল্কার মত দপ্ করে জ্বলে ছুঁয়ে যায় মোর মন।
তখন বুঝিতে পারি—
বিচিত্র সখী মানুষের মন, নিখুঁত যন্ত্র নহে,
পাঁচটার পরে ছয়টা সেথা না বাজে—
সাতটার ঘরে না আসিতে কাঁটা বারোটা বাজিয়া যায়।
সব ভুলে থাকি তবু ভেজে উপাধান।

আট

ফেল্ করে করে করিলাম বি-এ পাস,
তারি কল্যাণে জীবন-যাত্রা আজো করি নির্বাহ,
আপনারে ভুলে বাহিরের বিষে জর্জর হয়ে ফিরি,
স্নেহ-সুধারসে নূতন জীবন লভি।
আকাশের মেঘ নহে এ তো, নহে মেঘেতে বিজলি রেখা,
পদ্মাও নহে, নহে কাঞ্চন-নদী,
হিমালয় নহে, সাগরের তটে উঠে আর ভাঙে ঢেউ,
নহে ঝড়, নহে অবিরল জলধার।
ঘন অরণ্য নহে এর পটভূমি,
এ নহেকো ধু ধু মরুময় প্রান্তর—
চোখ-ঝলসান বিদ্যুৎ-দীপ নহে।
যে গাঁয়ে আমার বহু পুরুষের ভিটা,
যেথায় একদা হঠাৎ আসিয়া বিস্ময়ে আঁখি মেলি
বিচিত্র এই ধরণীর পেনু অপরূপ পরিচয়,
সে গ্রামের সে যে অতি-পরিচিত ছায়াসুশীতল দিঘি,
কূলে-কূলে ভরা কাকের চক্ষু জল।

তীরের বাতাস বনফুলে মধুময়,
অসীম যাত্রী পথিক-পাখির পাতা-ছাওয়া নীড়খানি।
বাহির-বিশ্বে ঝড়ে আর জলধারে—
হিমালয়-চূড়ে, উত্তাল-ঢেউ অসীম সাগর-বুকে,
মেঘ-বিদ্যুতে বিচিত্র ওই অগাধ শূন্য মাঝে—
বহুবল্লভী পতঙ্গ-মন, খুঁজে ফিরে বিস্ময় ;
বিস্ময় যবে টুটে, মনখানি ভরে যায় অবসাদে,
আতপতপ্ত ধূলিধূসরিত ঘামে ভিজে ওঠে মন,
শীতল দিঘিতে ডুবিয়া শীতল হই—
পাতা-ছাওয়া নীড়ে যাপি কালো নিশীথিনী ;
গ্রামের কুটিরে স্তিমিত প্রদীপখানি—
সন্ধ্যা জ্বালায়, স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত করে মন।
কিছু নাই বিস্ময়?
কে জানিত এই গাঁয়ের দিঘিতে এতখানি বিস্ময়!
বহু বিচিত্র পসরা লইয়া নিথর সরসী-বুকে
একটি-একটি করিয়া নয়ন মেলে শিশু-শতদল,
পাতা-ছাওয়া নীড়ে শাবক-কাকলি শুনি,
স্তিমিত প্রদীপে স্নেহরস তারা ঢালে।
অবাক হইয়া রহি—
নিরুদ্দেশের যাত্রী পথিক, যাত্রা ভুলিল তার।

নয়

তারো পরে তুমি উঁকি মারিয়াছ বাতায়ন-পথে সখী,
চোখা-চোখা নয়, চোখে-চোখে পরিচয়।
তুমি চেয়ে থাক, আমি চেয়ে থাকি মাঝখানে নদী বহে-
নদী? সে তো সখী, কূলভাঙা নদী নহে।
খাঁচায় বদ্ধ চখা এ-পারের ব্যাকুল চখীর চোখে—
শোনে 'এসো-এসো'—অতি ক্ষীণ আহ্বান।
না এলেও চলে, জেগে রবে সেও পল-অনুপল গনি,
আসে ভালো, নাহি উৎসাহ-অধীরতা!
কৈশোর গেছে, যৌবন যায়, যৌবন কারে কহ,
সব ঠেলে-ভেঙে দুর্বার বেগে চলা।
দেহের পরশ দেহ নাহি চাহে, 'আছ' এই অনুভূতি,
ভালোবাস কি না তাও নাহি জানিলাম।
মুগ্ধা হরিণী সাপের নয়নে হরিণ-নয়ন তুলি
চায়,—সেই চাওয়া প্রীতি-প্রদীপ্ত নহে।
ব্যাঘ্র কোথায়? হুঙ্কার করি শিকার সে নাহি ধরে।

যদি সখী তুমি আপনার ভুলে এসে পড় কাছাকাছি,
খাঁচার দুয়ার ঠেলে ছুঁতে চাও অলস শার্দুলেরে,
দেবতা তাহারে ক্ষমা করিবেন জেনো।

* * *

তোমরা সবাই সত্য আমার অঙ্কের ইতিহাসে,
সবাই মিথ্যা ছায়াছবি-পরদায়—
অনাদি-অসীম যাত্রা আমার, তার ইতিহাস নাই।
মরুপথে যেবা চলিতেছে সখী, মরীচিকা গুনে গুনে
প্রহর গনিয়া চলা কি তাহার সাজে?
আঁধি আসে আর আঁধি সরে-সরে যায়—
ধু ধু মরুভূমি পড়ে থাকে সীমাহীন।
তোমরা এসেছ, তোমরা গিয়াছ সরে,
একে-একে সখী, সব ছায়া রোদ হবে,
সব আঁধি পিছে পথের মতন পিছনে রহিবে পড়ে।
জননীর কোল হতে যে নেমেছে ভুঁয়ে,
প্রিয়ার আঁচল বাঁধে তারে কতদিন!
চির-পথিকের অজানা যাত্রাপথে
তোমরা হে সখী ছায়াসুশীতল পাদপ হইতে পার,
আঁধার মাটিতে শিকড় গাড়িয়া আছ।
আমার জীবনে শুধু
তোমা সবাকার খণ্ড-খণ্ড ছায়াময় ইতিহাস।
এর বেশি কিছু নহে,
আমি তোমাদের নহি—
চির-রৌদ্রের চির-আলোকের সঙ্গী পথিক আমি।

তমসা-জাহ্নবী

বহুরূপী আলোকের ক্লান্ত আমি রূপ দেখে-দেখে,
নিরাশ্বাস অন্ধকারে দু-দণ্ড বসিব নিরুৎসাহে—
তুমি বস কাছে মোর হাতে তব হাতখানি রেখে।
মনে কর সূর্য নাই, নাই শশী, নাই তারাদল ;
পথ ভুলি এ আঁধারে পশে না পথিক ধূমকেতু ;
খসে না জ্বলন্ত উল্কা ; প্রান্তরের আলেয়ার মতো
খেলে না বিদ্যুৎ-বিভা আকাশের প্রাঙ্গণ চিরিয়া।

আলোরশ্মিস্পর্শহীন অনন্ত-আদিম অন্ধকারে
বসে আছি দুইজনে, এইটুকু শুধু জানিয়াছি—
আলোকের সম্ভাবনা ঝলসে যোজন-কোটি দূরে।
সেথা হতে নিরন্তর রশ্মিমুখে আসিছে ছুটিয়া,
অন্ধমূক অন্ধকারে আসিছে সরলরেখা টানি,
পঁহুছিবে হেথা আসি হয়তো বা কোটি জন্মান্তরে,
পরশ করিবে স্নেহে আমাদের প্রস্তর-পঞ্জর ;
ভবিষ্য আলোর দূত গাহিবে মোদের জয়গান,
তমসা-তীর্থের কবি খ্যাত হবে আলোকের যুগে।

আজি সখী, আপনারে ভুলাব না আশার আলোকে ;
প্রেমের উৎসব শেষ আলোর উৎসাহ গেছে চলি—
পর্বতের গুহাগর্ভে ধূমে বহ্নি নির্বাপিত-প্রায় ;
তার কথা থাক আজি। তুমি কি গাহিবে সখী গান,
অতি ক্ষীণ ব্যর্থতার চুপে-চুপে কেঁদে-ফেরা সুর?
একদা জাহ্নবীতীরে গেয়েছ যা বিষণ্ণ সন্ধ্যায়—
পদতলে অবিরাম কলভাষে গৈরিক প্রবাহ,
শিয়রে মেঘের স্তূপ নদীজলে ফেলে কালো ছায়া।
যেন আমি বসে আছি বাত্যাক্ষুব্ধ বারিধির কূলে—
সুরের তরঙ্গাঘাতে যেন ভেসে চলে গেছি দূরে,
অতলে ডুবিয়া গেছি, বাড়ায়ে গানের বাহুদুটি
অনন্ত-অসীম শূন্যে তুমি মোরে ধরেছ তুলিয়া।

গানে তবে কাজ নাই, তুমি কি কহিবে সখী কথা—
যে কথা বলিয়াছিলে একদা প্রভাত-রৌদ্রকরে,
উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়ে, খরজলপ্রপাতের মুখে—
চূর্ণ-চূর্ণ জলধারা নিচে পড়ে ধোঁয়ার আবেশে,
না-বলা-কথার তোড় বাষ্প হয়ে ভরে দুই চোখ,
গুঁড়া-গুঁড়া সে কথার অর্থ আমি বুঝেছি সেদিন!
সে কথা আজিকে নহে ; তোমার নীরব করাঙ্গুলি,
আমার আঙুল ছুঁয়ে রক্তস্রোত চাপুক গোপনে।
আলোহীন, শব্দহীন, দিশাহীন, স্তব্ধ অন্ধকারে
বিশ্রাম লভিব মোরা ; আলো আর শব্দের আঘাত
সহিতে পারে না প্রাণ ; আলো-শব্দে লোভের সংঘাত—
চোখে লাগে, বাজে কানে, শিহরিয়া চমকিয়া উঠি,
খ্যাতির লালসে মন তলে-তলে কাঁদে গুমরিয়া,
আলোক ঝলসি ওঠে প্রাণে-প্রাণে হিংসার আকারে।

তার চেয়ে এসো সখী, ছিদ্রহীন অন্ধকারে বসি
অতীতের রৌদ্রে তোলা ছবি যত দেখি অনুভবে।

কুলুকুলু মহানন্দা, দুই তীরে শান্ত জনপদ ;
এপারে দাঁড়ায়ে এক ক্ষুদ্র শিশু গনে জল-ঢেউ—
এক, দুই, তিন, চারি ; কাঠের গোলার আশেপাশে
সঙ্গীরা প্রসন্ন মনে খেলিতেছে লুকাচুরি খেলা।
আকাশ আঁধার করি ওঠে মেঘ, নামে জলধারা,
জলশরবিদ্ধ হয়ে পরপার ঝাপ্‌সা দেখায়।
স্নানার্থী এসেছে যারা তারা কলকোলাহল তুলি
আছাড়ি সাঁতারি খেলে বরষার নবীন উল্লাসে।
নদীপাড়ে শিশুমনে সহসা সে অপূর্ব প্রকাশ—
টাপুর-টুপুর বৃষ্টি কোন্ সে নদীতে এল বান ;
গান তার ভেসে এল, শিহরিল বিহ্বল বালক।

সে গানের রেশ টানি এল শীর্ণ আজয়ের তীরে ;
বালি-কাঁকরের পথ, লালমাটি ছোট গ্রামখানি,
পূর্বপুরুষের ভিটা ; গিরিনদী গৈরিক বন্যায়
সহসা ফুলিয়া ওঠে, কৈশোরে ছাপিয়া যায় কূল!
এলোমেলো কত গান, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথের,
অদূরে নানুর-গ্রামে রচে পদ বড়ু চণ্ডীদাস—
মেদুর মেঘের মায়া আবার ঘনায়ে এল নভে।
গুচ্ছে-গুচ্ছে থরে-থরে নদীচরে ফোটে কাশফুল,
শীর্ণ হল জলধারা বালুরাশি নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

বালুচরে পদচিহ্ন মুছে গেছে ; সে কিশোর কবি
দেখা দিল, নুড়ি ছুঁয়ে যেথা ধীরে বহে গন্ধেশ্বরী,
পৌষসংক্রান্তির উষা, মেশে আসি দ্বারকা-ঈশ্বরে।
দূরে আকাশের গায় কালোছায়া বৃদ্ধ শুশুনিয়া—
কিশোর কবির মনে ঘনাইল পাহাড়ের মায়া,
শাল ও পলাশবন, ধু ধু মাঠ দিগন্তপ্রসারী।

নেশা না কাটিতে তার, বসন্তের সায়াহ্নে একদা
বিশাল পদ্মার তীরে এল যেথা কাঁপে ঝাউবন ;
সুপক্ক কুলের লোভে গুটি-গুটি খরগোস দল
চমকিয়া পদশব্দে ছোটে দীর্ঘ কান খাড়া করি।
সেখানে পাড়ের গায়ে, ক্ষণে ধসে-পড়া খাড়া পাড়—
গর্তে গর্তে উঁকি মারে লাল-ঠোঁট পাখিদের ছানা ;

ইলিশ ধরার নৌকা সার বাঁধি চলে জাল ফেলে,
বহুদূরগামী যত স্টিমারেরা যায় ধোঁয়া ছেড়ে,
পাশে-পাশে উড়ে চলে জলচর পাখি সারি-সারি।

মাঝ-গাঙে বালুচর, দুই-পাশে কলকল জল ;
তার ছন্দ সেইদিন শুনেছিল যে মুগ্ধ বালক,
পদ্মার আবর্তে পড়ি সেইজন হল দিশাহারা
বহু বৎসরের পরে, মেঘনা করিয়া অতিক্রম—
কালো আর রাঙা জল যেথা কষ্টে এক হয়ে মেশে।

মিলালো পদ্মার ছায়া, স্বচ্ছ জল চপল কাঞ্চন,
কিশোরীর বেণী যেন, হাঁটুজল শহরের ধারে ;
ভুলে-যাওয়া কবিতার অকস্মাৎ আবৃত্তির মতো—
গান গেয়ে ওঠে প্রাণ, কৈশোর যৌবনে আসি মেলে ;
রেললাইনের সাঁকো, পোড়ো বাড়ি আমের বাগান,
নির্জন সন্ধ্যায় যেথা মেঘে-মেঘে রঙের বিলাস,
গানে-গানে উন্মাদনা ; স্নান করি শান্ত নদীজলে
দেবতা-মন্দিরে যেন দেখা দিল তরুণ পূজারি।

সে পূজা হয়নি শেষ, মলিনা এ ভাগীরথী-তীরে
যৌবনের যত বাঞ্ছা, যত ক্লান্তি, রাখি যত গ্লানি ;
শুচিস্নান করি আজো পূজা সারি যাচিনু প্রসাদ।
কালো কলঙ্কের স্পর্শে জেগে ওঠে আবর্ত পঙ্কিল,
কল ও মিলের ধোঁয়া জেটি-নৌকা-স্টিমার বন্ধন,
এরই মাঝে কুলুকুলু কলকল বহে জলধারা।
সাবধানী মানুষের হাতে-রচা ফুলের বাগান—
বয়া ভাসে সারি-সারি আলো তাতে জ্বলে আর নেবে।
সহজ গানের ধারা বাধা পায় তবু গান জাগে,
মিনারের চূড়ে-চূড়ে তবু সুর ভাসিয়া বেড়ায়।

সে সুরের আধখানা তোমারে শুনায়েছিনু সখী,
পঙ্কিল আবর্তে যেথা জাহ্নবীর বিষদুষ্ট জল
ঘুরিয়া-ঘুরিয়া মরে। শুনেছিনু সে জাহ্নবীতীরে
আধখানি গান তব, সে অর্ধেক আজি অন্ধকারে
উঠুক সম্পূর্ণ হয়ে। কৃষ্ণধারা তমসার তীরে
নীরবে বসিয়া দোঁহে একমনে করি অনুভব—
যেন মোরা চলে গেছি, পার হয়ে লক্ষ জন্মান্তর ;

সেথা হতে শুনিতেছি, সাঙ্গ যত অসম্পূর্ণ গান—
পূর্ণ-অসম্পূর্ণ প্রেম ; আলোরে আড়াল করি দিয়া
আড়াল করিয়া দিনু জীবনের আশা ও আশ্বাস।

হে সখী, মোদের নয় আলোক-উজ্জ্বল ভাগীরথী ;
দুজনে বসিয়া আছি, বহে ধীরে তমসা-জাহ্নবী—
আবর্ত রচিছে কি না আঁখি মেলি দেখিতে না পাই,
অনুভব করি শুধু অবিরাম চলে জলধারা—
সম্মুখ-পিছন নাই, ঊর্ধ্ব-অধঃ না হয় ঠাহর,
আলো হবে একদিন এ আঁধার এইটুকু জানি,
আর জানি, মোরা দোঁহে বাঁচিয়া রব না ততোদিনে।
মোদের অগীত গান, না-বলা মোদের কথাগুলি,
তমসা-জাহ্নবী-তীরে চিরদিন বেড়াবে ভাসিয়া,
অন্ধকার কভু আসি উদিবে না আলোকের তীরে।

বিবেকানন্দ

হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।
ছিন্ন কাঁথা জীর্ণ চীর, স্পর্শে তব ভস্ম হোক,
ঘুচে যাক জড়ত্ব-বিকার।
হে সূর্য, প্রণাম লহ মোর—
তিমিরবিদারী তব দীপ্ত খর-করাঘাতে
ছিন্নভিন্ন হোক মায়া-ডোর।

বঙ্গভূমে স্বর্ণবহ্নি ধরি মানুষের দেহ,
জন্ম নিল মানবীর ক্রোড়ে,
আগুনে লালন করে, ধন্য সেই মাতৃস্নেহ,
দিগন্তবিসর্পী শিখা ওড়ে।
ওড়ে আর পুঞ্জীভূত জঞ্জালেরে করে ছাই
ভস্মে কালো হল গৃহাঙ্গন ;
জননী সভয়ে চাহে, কোলের সন্তান নাই,
অগ্নিশিখা স্পর্শিল গগন।
সে আগুন নাম নিল, বিবেক-আনন্দ নাম,
রামকৃষ্ণে অগ্নি করে নতি,
কোলে টানি শিষ্যে, গুরু কহিলেন, বুঝিলাম—
শিব, শিব, পতিতের গতি।
গুরুশিষ্যে কি ঘটিল ইতিহাসে নাহি লেখা,
গুরু রাখিলেন দেহ তাঁর—
দণ্ডধারী বহ্নিশিখা পথে বাহিরান একা,
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।
ছিন্ন কাঁথা জীর্ণ চীর, স্পর্শে তব ভস্ম হোক,
ঘুচে যাক জড়ত্ব-বিকার।
হে সূর্য, প্রণাম লহ মোর—

তিমিরবিদারী তব দীপ্ত খর-করাঘাতে।
ছিন্নভিন্ন হোক মায়া-ডোর।

সন্ন্যাসী ভ্রমেন একা হিমাচল পাদমূলে
হাতে দণ্ড, মুণ্ডিত মস্তক,
বিজন পার্বত্য-পথে নামিয়া এল কি ভুলে
দেহধারী জ্বলন্ত পাবক।
দেখিয়া সভয়ে সবে ছাড়িয়া দাঁড়ায় পথ,
মনে ভাবে স্বয়ং শঙ্কর—
ললাটেতে রাজটিকা, নাহিকো সারথি-রথ,
নাহি সহস্রেক অনুচর।
স্বপ্ন কিম্বা কর্ম দুই ভাবনার মাঝখানে,
সংশয়-আকুল তাঁর মন,
এ তীরের মহারাজা যেন ও তীরের টানে
পরিয়াছে গৈরিক বসন।
হেথা তাঁর কোন্ কাজ—ধরার ধূসর ধূলি,
তমোময় পঙ্কিল সংসার—
শ্মশানে শঙ্কর চলে বিষাণে নিনাদ তুলি—
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার ;
ছিন্ন কাঁথা জীর্ণ চীর, স্পর্শে তব ভস্ম হোক,
ঘুচে যাক জড়ত্ব-বিকার।
হে সূর্য, প্রণাম লহ মোর—
তিমিরবিদারী তব দীপ্ত খর-করাঘাতে
ছিন্নভিন্ন হোক মায়া-ডোর।

আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত ভারত ব্যেপে,
যেন শবদেহ একখান,
রুদ্রের চরণস্পর্শে কঙ্কাল উঠিবে কেঁপে,
তাই কি রুদ্রের অভিযান?
নগ্ন পদে, নগ্ন গায়, যেন আগুনের শিখা
জঞ্জালে ছুঁইয়া গেল স্নেহে,
ভারতের মৃত্তিকার সে লাঞ্ছনা-বিভীষিকা
অনুভব করি নিজ দেহে—
নয়নে উথলে অশ্রু, অগ্নিজ্বালা বুকে জ্বলে,
শবদুঃখে শিবের ক্রন্দন,

ওপার মুছিয়া যায় পায়ে যত পথ চলে,
প্রিয় হয় এপারের জন।
কোথা গুরু রামকৃষ্ণ—দূরে কন্যা-কুমারিকা,
সম্মুখেতে নীলাম্বু-বিস্তার—
মুহূর্তে পড়িল বীর আপন ললাট-লিখা।
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।
ছিন্ন কাঁথা জীর্ণ চীর স্পর্শে তব ভস্ম হোক,
ঘুচে যাক জড়ত্ব-বিকার।
হে সূর্য প্রণাম লহ মোর—
তিমিরবিদারী তব দীপ্ত খর-করাঘাতে
ছিন্নভিন্ন হোক মায়া ডোর।

সন্ন্যাসী পড়িল জলে মেলি শ্রান্ত ক্লান্ত আঁখি
ভারতভূমির পানে চায়।
কে ডাকিল 'ওরে বৎস,— কত কাজ আছে বাকি
বাছা মোর কোলে ফিরে আয়।
কাঁদিছে তেত্রিশ কোটি রোগে শোকে-নিপীড়নে,
বজ্রমেঘে ঢেকেছে আকাশ—
ভালবাস বুকে নাও আলো দাও অন্ধজনে'—
সন্ন্যাসী উঠিল সিক্তবাস।
ভারতের মৃত্তিকায় সিক্ত পদচিহ্ন রাখি
ললাটে জুড়িয়া দুই কর
উত্তরে প্রণাম করি, পশ্চিমে ফিরাল আঁখি,
শিব-শিব, শঙ্কর শঙ্কর।
ভারতের বাণীমূর্তি দাঁড়াইল রূপ ধরি
মূর্তি ভারতের সাধনার—
পূর্বাচল বহ্নিশিখা পশ্চিমে ভাসাল তরী—
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।
ছিন্ন কাঁথা জীর্ণ চীর, স্পর্শে তব ভস্ম হোক,
ঘুচে যাক জড়ত্ব-বিকার।
হে সূর্য, প্রণাম লহ মোর—
তিমিরবিদারী তব দীপ্ত খর-করাঘাতে
ছিন্নভিন্ন হোক মায়া-ডোর।

পশ্চিমে বিজয়লক্ষ্মী কণ্ঠে দিল জয়মালা,
বিজয়ী ফিরিয়া এল ঘরে,
কে বসিবে সিংহাসনে বক্ষে যার বহ্নিজ্বালা,
নীলাকাশ শিরে ছত্র ধরে।
পীড়িত আর্তের সেবা পতিত অন্ত্যজে প্রীতি,
দীনতা ভুলাতে দীনজনে
সংশয় তিমির ছেদি ওঠে সন্ন্যাসীর গীতি,
ধায় মন পঞ্চবটীবনে ;
মন্দির করিয়া আলো মহাকালী যেথা জাগে,
নাচে শ্যামা হৃদয়-শ্মশানে—
ক্ষুধিত জঞ্জালপুঞ্জে বহ্নির পরশ লাগে,
গুরু জানে আর শিষ্য জানে,
আঁধার গগনবক্ষে ধোঁয়াইয়া ধোঁয়া ওঠে,
বহ্নি জাগে তিমির-বিদার—
একটি কমল হতে সহস্র কমল ফোটে—
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

'আয় ফিরে, ফিরে আয় নন্দা'

গিয়েছিনু কাঞ্চন-পল্লী,
পিসিমারে গড় করি হাতে নিতে ছাতা-ছড়ি,
পিসি কন, 'সত্যিই চললি'।
আমি কহিলাম ধীরে, 'দেখ, মেঘ এল ঘিরে
রাস্তা তো নয় পিসি অল্প।'
'সত্যি তা বটে, তবে, আবার আসিবি কবে,
শোনাবি সবটা তোর গল্প!'
'যখনি সময় পাব, পা'র ধুলা নিয়ে যাব,
পথটা এমনই আর দূর কি?'
বাহির হইনু পথে, রাগ চেপে কোনো মতে
কিনিলাম কিছু মুড়ি-মুড়কি।
দশটা-পাঁচটা নয়, এ অধমই মহাশয়,
পিসিমার সোদরের পুত্র ;
বহুকাল পরে গিয়ে শূন্য উদর নিয়ে
ফিরে আসা, কে ভেবেছে কুত্র!

খাইতে-খাইতে মুড়ি চালায়ে দিনু পা-জুড়ি,
সহসা আসিল ঘোর ঝঞ্ঝা।
আকাশ ঘিরিল মেঘে বৃষ্টি নামিল বেগে,
পবনে-বরুণে খেলে পঞ্জা।
আমি বেগতিক বুঝি, ছুটি লোকালয় খুঁজি
এদিকে নামিয়া আসে সন্ধ্যা।
সহসা শুনিনু কানে, ডাকিছে কে কোন্‌খানে,
'আয় ফিবে, ফিরে আয় নন্দা।'

করুণ-কাতর স্বর, যেন বায়ু-মর্মর
চঞ্চল নারিকেল-পত্রে,
সেই স্বর অনুসরি ছুটিলাম পড়ি পড়ি
বৃষ্টি মানে না বাধা ছত্রে।
দু-ধাবে গভীর বন বায়ু করে শন্‌-শন্‌,
নাই কোথা মানুষের চিহ্ন,
সমুখে যতই চলি গাছে-গাছে গলাগলি,
কাঁটায় হইল দেহ ছিন্ন।
পদতলে জলধার ঝড় দেয় হুঙ্কার,
মুহু জ্বলে বিদ্যুৎ-বহ্নি—
ভাবিয়া অবাক হই কোথা হতে এল ওই
ঘোর বনে পল্লীর তন্বী।
আর পথ নাহি পাই চকিতে থামিয়া যাই,
নামিছে রজনী অতি বন্ধ্যা—
সহসা শুনিনু সুর, মনে হল নহে দূর,
'আয় ফিরে, ফিরে আয় নন্দা।'

কোনো দিকে নাই কিছু শুধু গাছ উঁচু-নিচু
ভয়ে ছম্‌-ছম্‌ করে গাত্র,
শুনিনু পাতিয়া কান বন-পথে ছোটে বান,
বায়ু করে শন্‌-শন্‌ মাত্র।
হইয়া হতাশ অতি ফিরাইয়া মোর গতি,
ভিজে-ভিজে ঘরে যাওয়া যুক্তি,
কে জানে বনের মাঝে সাপখোপ কত রাজে,
রাজপথে ফিরিলেই মুক্তি।
হঠাৎ তড়িতালোকে কি যেন পড়িল চোখে
ছুটিনু তাহাই করি লক্ষ্য,

নাকে-মুখে-চোখে-কানে বন-পথ যাধা হানে
মেলিয়া দুইটি কাঁটা-পক্ষ।
পঁহুছিনু অবশেষে বহু দুখে বহু ক্লেশে,
পড়ে আছে যেথা তপোমগ্ন—
প্রাসাদ, ইষ্টকে গড়া— পচিয়া কঙ্কাল মড়া,
তাহাও হতেছে ক্রমে ভগ্ন।
বুঝিলাম অনুভবে শিবের দেউল হবে,
চারিদিক জনহীন স্তব্ধ,
রহি রহি শোনা যায় বায়ু করে, 'হায়-হায়',
জল ছোটে কল-কল শব্দ।
দেউল আশ্রয় করি, একা জাগি বিভাবরী
যাপিব কি সে নিশির পর্ব—
হৃদয় কাঁপিল ভয়ে, নিরজন, দেবালয়ে
ভাঙিল আমার যত গর্ব।
কত কি উদিল মনে, ধীরে-ধীরে আঁখি-কোণে
নেমে এল ভয়হরা তন্দ্রা,
চমকিয়া জাগি ত্রাসে, কে ডাকে দেউল-পাশে,
'আয় ফিরে, ফিরে আয় নন্দা।'

বাহিরিয়া বার বার দেখিলাম চারিধার
নাহি জনমানবের চিহ্ন,
চামচিকা উড়ে-উড়ে মাথার উপরে ঘুরে,
বিজলি তিমির করে ছিন্ন।
সভয়ে রহিনু বসি, ভূতের আগারে পশি
ঘুম দিতে নাহি হল ভরসা ;
বসে-বসে গনি মনে এক-দুই অকারণে—
না জানি কখন হবে ফর্সা।
দেখিলাম তরু-শিরে ঝড় থেমে এল ধীরে
বৃষ্টির বেগ হল মন্দা,
কাঁপায়ে মন্দির-মেঝে কাতরে কাঁদিল কে যে
'আয় ফিরে, ফিরে আয় নন্দা।'

জাগিল ভোরের আলো— নিমিষে মিলালো কালো
বনভূমি করে শুচিহাস্য,
তখন পড়িল মনে কে ডাকিল বনে-বনে—
মনে মনে করি টীকা-ভাষ্য।

পুনঃ এনু রাজ-পথে ঘরে ফিরি কোনো মতে
ঘুম দিয়া দূর করি ক্লান্তি।
ভাবিয়া করিনু স্থির, এ ব্যাপার রজনীর
আমারি মনের হবে ভ্রান্তি।
আজো তবু পড়ে মনে, নিতান্তই অকারণে
বরষা নিবিড় যবে সন্ধ্যা—
করুণ ব্যথিত সুরে আজো শুনি কাছে-দূরে,
'আয় ফিরে, ফিরে আয় নন্দা।

মোহ-মুদ্গর

হেথা অনেক কান্না কেঁদেছে অনেক লোকে,
কেহ অভ্যাসে, কেহ খেয়ালের ঝোঁকে,
করুণ কাব্য রচেছে ধোঁয়ার ছলে,
বুকের ব্যথায় ভেসেছে নয়ন-জলে ;
নহেকো কান্না আর—
চোখের অশ্রু শুকায়ে এসেছে,
সময় হয়েছে প্রাণপণে লড়িবার।

হেথা বহু কৌশল দেখাল বহুত জনে
দাঁড়ি-কমা-হীন বিকৃত কণ্ঠরণে।
বক্তৃতা কত গগন ভেদিয়া ওঠে,
চপল রসনা মুখমদ কত ছোটে ;
নহে বক্তৃতা আর—
কণ্ঠের ভাষা রুদ্ধ হয়েছে,
সময় হয়েছে চুপি-চুপি মরিবার।

হেথা বহুকাল ধরে বহু হল পদসেবা,
চিনিতে নারিনু কেবা রানী বাঁদী কেবা,
কে মাগিছে জল, কে শুধু টানিছে ঘানি,
প্রভুরে দিতেছে কে আপন দানা-পানি ;
নহে পদসেবা আর—
হাতের তেলোয় কড়া পড়িয়াছে
সময় হয়েছে চড়া সুর ধরিবার।

হেথা অনেক কলহ করেছে পরস্পরে
কাজের বেলায় অকাজের অবসরে,
দুয়ারে শত্রু তবুও মনের সুখে
হেনেছে কুঠার আপন জনের বুকে ;
নহে কোন্দল আর—
সমুখে দাঁড়ায়ে শত্রু হাসিছে,
সময় হয়েছে তার হাসি হরিবার।

হেথা মানুষ হয়েছে অনড় পাষাণ-সম,
উদয়-আলোকে ঢাকিছে অস্ত তম ;
অতীত কীর্তি সম্মুখে রচে বাধা,
নূতন যন্ত্র প্রাচীন মন্ত্রে বাঁধা—
নহে বন্ধন আর ;
প্রাচীন ভিত্তি শিথিল হয়েছে,
সময় হয়েছে পাকা ভিত গড়িবাব।

হেথা অসীমকালের চক্র-আবর্তনে,
নাহি জানি কবে কোন সে অশুভক্ষণে
গিয়াছি পড়িয়া সে চাকার সব নিচে,
চলি চোখ বুজে সকলের পিছে-পিছে,
নহেকো পিছনে আর—
কালের চক্র ঘুরিয়া গিয়াছে,
সময় হয়েছে উপরেতে চড়িবার।

হেথা প্রহরী নিত্য ফিরিছে চুরির লোভে,
বিষ খেয়ে শিব কাঁদিছে মনঃক্ষোভে,
শ্মশানে যেন রে পুঞ্জিত চিতা-ধূমে,
রাত হল ভাবি দিবস লুটায় ঘুমে,
নহেকো নিদ্রা আর—
নিকটে মরণ বাহু মেলি আছে,
সময় হয়েছে বোঝাপড়া করিবার।

দিনান্তে

হে দেবী, তোমার করিতে পারিনি সেবা,
এতকাল শুধু করেছি পূজার ভান-

বুঝিতে পারিনি কে মহিষী, বাঁদী কেবা
না জেনে হয়তো করিয়াছি অপমান।
যে আলো দেখেছি গগনের কালো বুকে
ভুল করে গেছি আলেয়া তাহারে ভাবি ;
যে আলো চকিতে ঝলসে মশালমুখে
সেই করে গেছে সূর্য-প্রণাম দাবি।

হাটের ভিড়েতে হয় না তোমার পূজা
মুদ্রাযন্ত্র নহেকো যন্ত্র তব—
তুমি বীণাপাণি, নহ তুমি দশভুজা,
নূতনের যুগে যত সাজ অভিনব।
যন্ত্রেরে বীণা ভাবিয়াছিলাম ভুলে,
মনে হয়েছিল শোনা যায় কিছু সুর,
আজিকে সহসা দেখি যে হিসাব খুলে
তোমা হতে দেবী চলে গেছি বহুদূর!

হে দেবী, দিবস মিলায় অস্তাচলে,
ভুল ভাঙিবার আছে কি সময় আর—
ভাস্বর দিন কেটে গেল কোলাহলে
প্রতিহারী সেজে রাখিনু তোমার দ্বার ;
তব মন্দিরে বিফল খবরদারি
এতকাল যারা করিয়া আসিল দেবী,
নয়নে তাদের ঘনায় নয়ন-বারি—
যেতে চায় কাছে নিভৃতে তোমারে সেবি।

ভাবিয়া এসেছি, সাহিত্য-হরিজনে
অশুচি করিছে মন্দির-প্রাঙ্গণ ;
শতমুখী হাতে তাই যে ভ্রান্ত মনে
পাপ বিদায়ের করিয়াছিলাম পণ।
সে পাপের জ্বালা জ্বলিছে অঙ্গজুড়ে,
নারিনু জননী, পঁহুছিতে তব কাছে,
বাহির দেউলে শুধু মরিলাম ঘুরে—
আজি অবেলায় আর কি সময় আছে!

মনপথে যেথা তোমার নিকটে গতি,
কি হবে রুধিয়া সেথা বাহিরের দ্বার ;
এতদিনে দেবী, দিয়েছ এ শুভমতি—
সবার সমান দেবী-পূজা-অধিকার।

শুচিস্নান করি হে দেবী, সন্ধ্যাবেলা
তোমার পূজায় ভক্তে বসিতে দিও-
দিবসে আমার করিয়াছি অবহেলা
দিনান্ত মোর হয যেন রমণীয়।

স্বপ্ন-জাগরণ

নিঃশব্দ, নিঝুম, স্তব্ধ মধ্য যামিনীতে—
নিদ্রা হতে কেন জানি সহসা জাগিনু ;
শয্যা 'পরে বসিলাম উঠি—আঁখি মেলি
স্তিমিত আলোকে স্বপ্নসম দেখিলাম,
প্রিয়া মোর গভীব-সুষুপ্তিমগ্ন, আশা
ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ বক্ষ তাব ,—মৃদু
হাসি ওষ্ঠ-প্রান্তে—যামিনীর উচ্ছলিত
আনন্দের শেষ। এলাযিত বাহুদুটি ,
আলুথালু কেশ ,—স্রস্তচ্যুত গাত্র-বাস ,
সরম-সঙ্কোচ যত মুদ্রিত মুদিত
নয়ন-পল্লব-প্রান্তে , নগ্ন ক্ষুদ্র তাব
চরণ দুখানি অলক্তরঞ্জিও, শুভ্র
শয্যা সবোবব 'পবে—কমলের মত।
বাহুমূলে স্তব্ধ কত কঙ্কণ-কিঙ্কিণী ;
অতি মৃদু বহে শ্বাস, বক্ষ মৃদু-মৃদু
ওঠে কাঁপি,—গভীর আশ্বাস-ভরে যেন।

দেখিলাম চাহি ক্ষীণ-দীপালোকে যেন
স্বপ্ন রচিবারে চায় ক্ষুদ্র শুভ্র মোর
সেই গৃহটি ঘেরিয়া।
ধীরে মনে হল—
স্বপনের মাঝে কে যেন দিয়েছে ডাক
প্রিয়াপাশে সুপ্তি-মগ্ন মোরে—অতি দূর—
দূরান্তর হতে। যেন তারে চিনি, যেন
তারে চিনিনাকো। স্বপনের মাঝে আসি
আমারে কহিল ডাকি, "আয় ওরে আয়!"
নিদ্রাভঙ্গে, স্বপ্নভঙ্গে সকলি মিলায়—
মূর্তি তার মনে নাহি জাগে ; পরিচিত

ডাক শুধু শোনা যায়—"আয় ওরে আয়!"
আমারে করিয়া গেল উদাস-ব্যাকুল।
প্রেয়সীর মুখপানে চাহি মনে হল
সে যেন অপরিচিতা মোর ; যে বন্ধনে
বদ্ধ ছিনু, দেখিলাম বন্ধন সে নহে!
যেন আমি যেতে পারি ; সব মিথ্যা, মোহ
সবি ; ওই প্রিয়া, এই গৃহ, এ শ্যামল
ধরা—অন্ধকাবে সকলি মগন, মিথ্যা
স্বপ্নজাল সৃজন করিছে যেন ক্ষুদ্র
এই আমারে ঘিরিযা। দেখিলাম চাহি
বাতাযন-পথে, ঘন-ঘটাচ্ছন্ন স্তব্ধ
নিশীথ-আকাশ ; সত্য বলি মনে
হল ওই দূর, ওই দূব অজানার
ডাক।

কে তুমি ডাকিলে মোরে? কোথা যাব
আমি? কেমনে কাটিব আমি এই স্বপ্ন-
জাল? গাঢ় করি দাও অন্ধকার ; সব
ছেড়ে চলে যাই। আমারে দেখাও তুমি
পথ। স্বপ্ন ভুলি মোহ ভুলি যাই আমি
চলি—দূর অজানিত কোন্ পরিচিত
পুরে।—

ঘনাইল অন্ধকার গাঢ়তর
মেঘে। সচকিত হইল দামিনী, কৃষ্ণ
বক্ষ আকাশের চিরিয়া-চিরিয়া ; ক্ষণে
ক্ষণে গভীর গর্জনে গরজি উঠিল
মেঘ। প্রিয়া মোর উঠিল কাঁপিয়া ; ভীত
ত্রস্ত আঁখি মেলি চাহিয়া আমার মুখ
পানে ; মৃদু হাসি গভীর আশ্বাসে মোরে
জড়াইল বাহুপাশে।

পলকে মিলায়
জাগ্রত স্বপন মোর। মনে হল সত্য
প্রিয়া ; সুন্দর জগৎ। দূর গেল অতি
দূরে সরি। যত্নে প্রেয়সীর ওষ্ঠ-প্রান্তে
করিনু চুম্বন, বাহুপাশ দৃঢ় হল
তার।

সহসা বাতাসে দীপশিখা নিবে
গেল। স্বপ্ন হল সবি। সত্য শুধু আমি,
আর চির-পরিচিত প্রেয়সী আমার!

জাগরণী

তুমি বলিয়াছ, তোমার মনের ক্ষুধা
আজো জাগে নাই আমারে কেন্দ্র করি।
অসহ আবেগে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাঙে সুধা
মরু-বালুতটে তিলে-তিলে যায় মরি।
তব বালুতটে বহে কি ফল্গুধারা,
তরঙ্গ মোর তাই নাহি পায় সাড়া?
উন্মাদ ঢেউ ওঠে-পড়ে দ্বিধাহারা,
গুমরিয়া কাঁদে চির-দিবাবিভাবরী।
তুমি বলিয়াছ, তোমার মনের ক্ষুধা
আজো জাগে নাই, আমারে কেন্দ্র করি।

মরুপথে আমি চলেছিনু উদাসীন,
শুষ্ক স্রোতের শীর্ণ রেখাটি টানি ;
ভেবেছিনু মনে শেষ হয়ে এল দিন—
মূক হয়ে এল মনের মুখর বাণী।
তিমির বনানী উদার অন্ধকারে
ঢাকিবে আমার দুঃসহ দুখভারে—
হেনকালে তুমি সুগোপন পদচারে
সহসা সমুখে দাঁড়ালে বনের রানী।
মরুপথে আমি চলেছিনু উদাসীন,
শুষ্ক স্রোতের শীর্ণ রেখাটি টানি।

দিনের রৌদ্র স্তিমিত পত্রছায়ে
আপনি আড়াল, ঘুঘু যেন দিল ডাক ;
শ্রাবণ-গহনে যেন ঝঞ্ঝার বায়ে
ঘন কালো মেঘে উঁকি দিল বৈশাখ।
শ্যাম-তৃণদলে ছুঁয়ে যায় রবিকর,
শাখা-অবকাশে হাসিছে দ্বিপ্রহর,
মায়া-গোধূলির এ নহে আড়ম্বর,
নির্বাক নহে, বাণী মোর হতবাক।

দিনের রৌদ্র স্তিমিত পত্রছায়ে
আপনি আড়াল, ঘুঘু যেন দিল ডাক।

বিস্ময় মানি চাহিলাম আঁখি তুলে,
ফুলিয়া-ফাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ ;
মরুবুকে যেন তরঙ্গ ওঠে দুলে,
দুইকূল ভেঙে ছোটে জীবনের বান।
তুমি গান গাহ বনের আড়ালে বসি,
আমার আকাশে পড়ে না উল্কা খসি—
এ যে খররবি, নহে দ্বাদশীর শশী,
তরুণ দিবস, নহে দিবা অবসান।
বিস্ময় মানি চাহিলাম আঁখি তুলে,
ফুলিয়া-ফাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ।

প্রথম আবেগে দুটি তব হাত ধরি,
নিবে আসা প্রেম নিবেদন করিলাম ;
কোন্ অতীতের কোন্ পরিচয় স্মরি,
সহজ প্রণামে দিলে কি প্রেমের দাম?
বলিলে, "আমার থাকো প্রণম্য তুমি—"
ছলছল জল, সুগভীর বনভূমি,
দুর্মদ স্রোত, তটেরে চলে না চুমি—
খরবেগে তার পূর্ণ মনস্কাম।
প্রথম আবেগে দুটি তব হাত ধরি,
নিবে আসা প্রেম নিবেদন করিলাম।

তখন বুঝিনি, আজো না বুঝিতে পারি,
কি ছিল তোমার মনের অন্তরালে ;
আকাশের মেঘ ঢালে অকারণ বারি—
আমি বাঁধা পড়ি আপনার মায়াজালে।
তোমারে সৃজিয়া তোমারেই ভালোবাসি—
ভক্তিসাগর পার হয়ে প্রেমে ভাসি,
আপনার মনে রচিয়া কান্না-হাসি,
প্রেমের তিলক পরাই তোমার ভালে।
তখন বুঝিনি, আজো না বুঝিতে পারি,
কি ছিল তোমার মনের অন্তরালে।

ক্ষুধা তব আজো জাগেনি আমারে ঘিরি—
কবে তা জাগিবে, আমিও জাগিয়া রব ;

দখিন পবনে বহে যাবে ধীরি-ধীরি—
মোরে একদিন মানিবে কি অভিনব।
মরু-বালুতটে শ্যামল তৃণের দল—
তারে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে জল ববে কল-কল,
তোমারে ছলিবে আমার মনের ছল—
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কানে স্তবের বচন কব।
ক্ষুধা তব আজো জাগেনি আমারে ঘিরি,
কবে তা জাগিবে, আমিও জাগিয়া রব।

প্রেয়সী, আজিকে তোমার প্রণামখানি,
লইনু প্রেমের প্রথম স্মরণরূপে ;
আমার মনের কাটুক সকল গ্লানি,
তোমার নতির পূত মঙ্গল-ধূপে।
শুভ জাগরণে যাক স্বপ্নের জ্বালা,
দেহবেদিতলে থাকুক কুসুমডালা,
জানি একদিন তুমিই গাঁথিবে মালা—
পরিব একদা সেই মালা চুপে-চুপে।
প্রেয়সী, আজিকে তোমার প্রণামখানি
লইনু প্রেমের প্রথম স্মরণরূপে।

একটি গল্প

ঘাটে তরীর বাঁধন আমি খুলিয়াছিলাম,
আমি একেলা চেয়েছি যেতে ওপার-পানে,
তুমি সহসা এলে—
যেন ছায়ার মায়া।
মোর ধূসর দিবস ধীরে হইল কালো,
আমি ওপার ভুলিয়া থাকি এপারে বসে॥

ঠিক বাঁকের মুখে তুমি দাঁড়িয়েছিলে,
মোর হল না ঠাহর তুমি তুমিই কি না!
কেন খানিক চেয়ে
মুখ করলে নিচু
কালো নয়ন মেলে কেন চাইলেনাকো,
কেন কাঁখের কলসিটিরে নামালে ভুঁয়ে॥

ধীরে আঁধার নামে দূর বনের শিরে,
খাড়া তাল-নারিকেল সৃজে স্বপ্ন যেন,
মোরা দুজন শুধু
থাকি বিজন ঘাটে,
জাগে সহসা জোয়ার রাঙা নদীর জলে,
বাঁকা চাঁদ উঁকি দেয় দূর তালের বনে॥

যেন মহাজনী পদ—তার চরণ দুটি
কোন্ রাখাল-ছেলে গায় বাঁশির মুখে—
সুর বেড়ায় ভেসে
নদী জলের ঢেউয়ে
তীরে পুরবীয়া বায়ু ধীরে হয় মন্থর,
তুমি চকিতে চাহিলে কোথা ননদী তব॥

যেন কণ্ঠের হারখানি ফেলিলে টুটি,
গেল ছড়িয়ে মাটিতে ভিজা মুক্তাবলী,

কারা কুড়ায় মণি,
তুমি তাহার ফাঁকে
এসে ত্রস্তে কাছে মোরে পরশ কর—
বাঁকা চাঁদ ডুবে যায় দূর তালের বনে॥

হায় কোথায় তুমি, আমি কবিতা লিখি,
পাশে চণ্ডীদাসেব পদ রয়েছে খোলা—
মোহ ঘনায় মনে,
বসে তোমারে ভাবি—
কালো মেঘের ছায়ায় কালো যমুনার নীর,
নামে দু-কূল আঁধার করি বৃষ্টিধারা॥

* * *

টবে স্নান শেষ করি বুঝি ড্রইং-রুমে
তুমি একেলা বসিয়া আছ সিক্ত চুলে,
বসি পিয়ানো-টুলে
চাবি যেতেছ ছুঁয়ে—
সুরে মুক্তার মালা যেন মেঝেয় পড়ে,
কাঁপে ছোট ঠোঁটদুটি কোন্ গানের সুরে॥

ওই সদর-দুয়ারে কে যে আঘাত করে,
তুমি চমকি উঠিয়া দাও দরজা খুলে,
এল মানিক-দাদা
যার চোখের নিচে—
কালো ভোমরা যেন কালো জড়ুল-রেখা—
পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পড়ে, তবু কবিতা লেখে॥

ধরা ছোঁয় কি না ছোঁয় তার চরণদুটি,
পায়ে লপেটা ভাবের ঘোরে গড়িয়ে চলে,
কোঁচা লুটায় ভুঁয়ে,
কাছা এলিয়ে পড়ে,
কালো জুল্‌পি গালেতে যেন ছোবল মারে,
চোখে স্বপ্ন সৃজন করে চশমা-জোড়া॥

বাম হাতে তার ডাঁটা-ধরা পদ্ম দুটি—
তুমি আনমনে এলোচুলে বাঁধলে খোঁপা,
কত লীলার ভরে

গুঁজে খোঁপায় নিলে—
ছুঁল পদ্ম-মৃণাল যেন মৃণাল-ভুজে,
আধ শরমে মুকুরে দেখ মু'খানি তব॥

বসে পাশাপাশি চলে কত মৃদু গুঞ্জন,
শুনে পাশের ঘরে মা যে বলেন ডেকে,
কে রে মানিক বুঝি,
এত দেরি বা কেন—
খুকি, শুধো তো ওরে খাবে চা কি এক কাপ?
যদি খিদে পেয়ে থাকে দুটো ডিম ভেজে দিই।

শুনে মায়ের কথা ওঠ দুজনে হেসে,
জোরে হাসতে খোঁপার চুল মুখেতে পড়ে।
ওঠে মানিক-দাদা,
আল গোছেতে যেন
ওড়া চুলগুলি মুখ হতে সরিয়ে দিলে,
তুমি লজ্জায় তারে এক মারিলে ঠেলা॥

যেন শাস্তি দিতে এই দস্যিপনার
হাত চাপিয়া ধরে তব মানিক-দাদা।
—খুকি, শোন্ এদিকে,—
ঠিক 'গোলে'র মুখে
যেন সেন্টার-ফরোয়ার্ড পিছলে পড়ে,
তুমি ছিটকে বেরিয়ে গেলে মায়ের কাছে॥

বসে বোকার মতন থেকে মানিক-দাদা
পাতা উল্টিয়ে দেখে 'নয়া সাপ্তাহিকে'র
যত তরুণ কবি
লিখে 'প্রেমের পাজ্‌ল'
দিলে প্রেমের রাস্তা ঢের সহজ করি,
হাতে চায়ের পেয়ালা তুমি ঢুকলে ঘরে॥

তুমি আড়চোখে চেয়ে দেখ কাগজটাকে,
কান লাল হয়ে ওঠে তব মানিক-দাদার ;
বলে, বেড়াতে যাবে?
আজ 'রিগালে' আছে
'মিড সামার নাইট্‌স ড্রিম-স্বপ্ন-ছবি,
দেখ মাসিমাকে আমি তবে বলব গিয়ে॥

শেষে 'রিগালে' সকল কাজ 'লিগাল' নহে,
প্রেম-পাজ্‌ল তোমারও ক্রমে ঘনিয়ে ওঠে ,
তুমি অনেক ঘেমে
শেষে বাইরে এলে,
এল 'বটম'-মানিক-দাদা গাধার মত,
পরে হাঁকিয়ে ট্যাক্সি গেলে লেকের ধারে ॥

* * *

কালো যমুনার কালো জলে আকাশের চাঁদ
রাধা-কৃষ্ণে ভেবে পড়ে ঝাঁপিয়ে জলে,
চেয়ে সে কালাচাঁদে
ওঠে সিক্ত বাসে,
আমি গাছের আড়ালে তাই দাঁড়িয়ে দেখি,
চল বসন নিঙাড়ি মোর পরান-সাথে ॥

মেঘে ঢেকে যায় ধীরে-ধীরে চাঁদ ষষ্ঠীর,
ক্রমে বৃষ্টিধারায় ঘাট হল যে পিছল,
ঘন নিবিড় বনে
কার বাজল বাঁশি,
কুহু তিমির-রাতে চলে গোপনাভিসার,
তীরে কুঞ্জবনে তুমি আমায় খোঁজ ॥

* * *

কড়া নজর বাপের, এই শ্রাবণ মাসে
ট্রেন স্টিমার চেপে গেল মানিক-দাদা—
ঢাকা কায়েতটুলি ;
ওঠে উলুধ্বনি,
তুমি গুমরে কাঁদ এই ভবানীপুরে,
বউ সঙ্গে করে এল মানিক-দাদা ॥

তুমি মায়ের সাথে বউ দেখতে গেলে,
বউ ধরলে তোমার হাত মুচকি হেসে,
মুখ কানের কাছে
এনে বললে মৃদু,
সব শুনেছি মজার কথা 'উনির' কাছে।
মনে বললে তুমি, দ্বিধা হও ধরণী ॥

আসে আবার সেজে সাদা মানিক-দাদা
চায় লোলুপ হাতে তব কপোল ছুঁতে।
যার মাহিনা বাঁধা,
সেও উপরি-কাঙাল।
তুমি ঘৃণায় বললে, আর এসো না হেথা।
গেল বোকার মতন হেসে মানিক-দাদা॥

তবু মানিক-দাদা—তারে প্রণাম করি
তুমি বললে মাকে বিয়ে করবে নাকো,
লেক রোডের স্কুলে
নিলে চাকরি শেষে,
মোর চাকরি সেদিন হতে হয়েছে শুরু—
পথ তৈরি হল ভাঙা ফাটল দিয়ে॥

* * *

শোন প্রেয়সী শোন, আজ রাত্রিবেলা
দূরে বিজন পথে কে যে গান গেয়ে যায়-
তুমি শুনতে কি পাও?
আমি রাত্রি জেগে
হেথা কবিতা লিখে একা পড়ছি বসে,
মোর সঙ্গী চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি॥

কবে যমুনার কূলে কোন্ কিশোর কবি
গেল বাঁশির সুরে তার কবিতা লিখে,
যুগ-যুগান্তরে
মুছে যায়নি সে তো,
তার বাঁশির ভাষা লেখা সকল প্রাণে—
চোখে ঘুম আসে যে, প্রিয়ে, ঘুমিয়ে পড়॥

চলতি ছন্দ

বেহালার মঞ্জুলিকা রায়,
চপলা নন্দীর কাছে শিখীনৃত্য শিখিয়াছে,
নাচিয়াছে বহু জলসায় ;
নজরুলী গজল-সুরে দিলীপী আখর জুড়ে
অতি-আধুনিক গান গায়।

কলেজে তাহার নামে ছড়া লেখা থামে-থামে,
সম্বোধন পাখায়-পাখায় ;
বেহালার মঞ্জুলিকা রায়।

দাদখানি চাল ফুটছে হাঁড়িটায়,
স্বপন দেখে কাটে চাঁদনী রাত—
দিনের দিন দিন যে চলে যায়,
আমানি হয় 'উবু-গরম' ভাত।
এদিক-ওদিক পাড়ায় যারা থাকে
তারাই দুদিন বাড়িয়েছিল হাত,
বয়স এবং বুদ্ধি যতই পাকে,
আমানি হয় 'উবু-গরম' ভাত।

অর্থাৎ মঞ্জু করেনাকো চুলবুল,
যায়নাকো কলেজে পিঠে ফেলে এলোচুল,
পিছনে চাহে না নিজে কি জানি হইল কি যে,
তোলে না চমক রোজ পাল্টে কানের দুল।
পড়া শেষ করে বসে মার কাছে নিয়ে পান,
সন্ধ্যায় ছাতে উঠে গায় না টুকরা গান,
সিনেমা-জলসা-'হবি' মঞ্জু ছেড়েছে সবি—
পাষাণ-তটের বুকে ঢেউ ভেঙে খানখান।

রামজয় বোস টিকে গেল শেষতক।
কাজ হল তার দুবেলা হাজির দেওয়া :
শোনো না মঞ্জু, তবু করে বকবক,
মনে-মনে ভাবে—সবুরে ফলিবে মেওয়া।
মঞ্জু-জননী রামেরে বাসেন ভালো,
দেখিতে-শুনিতে-বলিতে ছেলেটি বেশ—
বনেদিও বটে, খুব উঁচু নয় চালও,
পৈতৃক ধন আছে কিছু অবশেষ।

রামজয় খুশি রয়
শুধু সান্নিধ্যে ;
মঞ্জুর মন জুড়ে
একচুল ছিদ্র
নাই থাক, খোঁজে ফাঁক—
হায় প্রেম-বিদ্ধ!

জ্ঞানহীন চিরদিন
চায় যে নিষিদ্ধে।

এমন সময় দক্ষিণে-পুবে নামিল ভীষণ বান,
পূজার মুখেতে জলে ডুবে গেল দেশ,
উঠে চৌদিকে 'গেল-গেল-রাখ' আর্তের আহ্বান—
এ মহাপ্রলয়ে বুঝি সৃষ্টির শেষ।
নদীয়া-যশোর হল যায়-যায়, তলাইল রাজশাহী,
মুর্শিদাবাদে আবাদ পচিল জলে—
রিলিফ ছুটিল লাঞ্চ ও নৌকা ডোঙা ও গামলা বাহি,
রিলিফ-জলসা জমে গেল 'হলে-হলে'।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শঙ্কর ঘোষ করে সঙ্কট-ত্রাণ,
পশ্চাতে তার বড় বড় চাঁই নিজেরাই আগুয়ান ;
ধুতি-কম্বলে ভরে গেল দিক,
চাঁদা কত এল নাই তার ঠিক,
ক্যাম্প ফেলা হল ঈশ্বরদিতে বিশ-পঞ্চাশখান—
চরকির মত ঘোরে শঙ্কর,
নাহি আত্মীয় নাই তার পর,
কভু বা শহরে, কভু নৌকায় দাঁড় ধরে মারে টান।

খদ্দর গায়ে দরদর ঘেমে বেহালা ডিপোর কাছটায় নেমে
নম্বর খুঁজে দুই বার থেমে এল শঙ্কর ঘোষ—
টি. এন. রায়ের বৈঠকখানায় রায় সাহেবেরে সেলাম জানায়,
এসেছে না মানি কাহারও মানায়—এই তার সন্তোষ।
বলে, সার্, এক ভিক্ষা যে আছে, ফ্লাড-রিলিফের গানে আর নাচে
মঞ্জু দেবীর ডাক পড়িয়াছে, দিতে হবে অনুমতি।
থতমত খেয়ে শ্রীতপন রায় ডাকেন, মঞ্জু, এইদিকে আয়।
শঙ্কর ঘোষ? মঞ্জু তাকায়।—শঙ্কর-পার্বতী।

নিউ এম্পায়ারে মোটরে ও টায়ারে
করছে যে গিজগিজ লোক ঢোকা ভার,—
যেন হুতাশন-শিখা শ্রীমতী মঞ্জুলিকা,
দেয়ালে শহর জুড়ে ছবির বাহার।
হয়েছে 'হাউস ফুল', তোড়া-তোড়া আসে ফুল,
বাণী কহিলেন সেথা অনেক নেতার,
হঠাৎ নিবিতে আলো মঞ্চে নামিল কালো
মঞ্জুর ছায়া নাচে সাদা পর্দায়।

নাচিছে মঞ্জুলিকা,
দোলে দিগন্তে থইথই জল,
নাচে তরঙ্গে চরণ-কমল—
তিমির ভেদিয়া ফুটিছে যেন রে
নব-অরুণের লিখা।
মূর্চ্ছাভঙ্গে জাগে ধরাতল,
দেখিল শূন্যে জ্বলে প্রোজ্জ্বল
আদিম বহ্নিশিখা।

ব্রহ্মচারী শঙ্করের চিত্তে বুঝি তপোভঙ্গ হয়—
ঋষি শুকদেবে স্মরি মনসিজে করিল সে জয় ;
কহিল, এ সব মায়া, দুষ্ট মার পাতে মোহ-জাল,
জলমগ্ন বঙ্গদেশ, জলে ভাসে শুধু গৃহ-চাল,
মরিছে মানুষ-গরু, তাহাদের বাঁচাইতে হবে।
'বন্দে মাতরম'-মন্ত্র উচ্চারিয়া অর্ধস্ফুট রবে
হুঙ্কারিয়া পড়ি স্টেজে আরম্ভিল ওজস্বী বক্তৃতা—
সরিয়া দাঁড়াল পাশে মঞ্জুলিকা লজ্জাভয়ভীতা।

টাকা তুলে সব ভুলে চুলবুলে শঙ্কর
নদীয়ায় চলে যায় নাহি চায় পশ্চাৎ
মঞ্জুর মন দূর বন্ধুর সঙ্গে
কলকল-ছলছল ঘোলা জল যত্র।
ঘরে খিল দিয়ে মিল-কিলবিল-কাব্য
লিখে যায়। দেখে মায় কর্তায় বললেন,
মেয়েটার গতি—আর কবে পার করবে?
শঙ্কর-কঙ্কর—মন পর মঞ্জুর।

খুলব কি খুলব না— ভাবনায় উন্মনা
শঙ্কর ছেঁড়ে খাম শেষটায়,
মনের আগুন কার ছোঁয় অঙ্গুলি তার—
সামলায় প্রাণপণ চেষ্টায়।
—তুমি দিতে পার জানি জীবনের সবখানি,
নিতে পারি নাহি মোর সাধ্য ;
এল দুর্দিন ঘোর, মাতা নিপীড়িতা মোর,
এ জীবনে তিনিই আরাধ্য।

—মাতা তব মা নয় আমার?
বাতায়নে মঞ্জুলিকা, দিগন্তে আকাশ-গায়ে আলোর বিথার।

শ্বেত শুভ্র খণ্ড মেঘ বায়ুভরে ভেসে-ভেসে যায়,
মেঘ নামে আঁখির পাতায়।
—তুমি জান, আমি তাঁরে সেবিতে জানি না?
মিথ্যা তব এই অহঙ্কার,
আমিও সন্তান তাঁর, বুদ্ধিহীন, হই দীনাহীনা—
আমারে ঠেলিয়া দূরে চলিবে কি মায়ের সংসার?

এমনি করে চলল দিন,
পেরিয়ে গেল বছর তিন,
বাংলা হল শঙ্কাহীন।
শঙ্কর
কর্তা সেবক-সমিতির,
উচ্চে তোলে উচ্চ শির ;
বাংলা দেশে নূতন পীর
শঙ্কর।

রামজয় বোস আজো ছাড়ে নাই হাল,
আজ সে বিফল, জানে হতে পারে কাল।
জননী না জানে আজো মঞ্জুর মন,
রামেরে ভাবেন ভাবী জামাতা-রতন,
আশকারা পেয়ে-পেয়ে রামজয় বোস,
দিন-রাত আসে আর করে ওঠ-বোস।
হাসিয়া মঞ্জু বলে, রামজয়-দাদা,
মাটি হলে এতদিন হতে তুমি কাদা।

'দাদা' ডাকে রামজয় গলল,
বলল, তাহাই হোক ভগ্নী,
লগ্নী এ কারবার করলাম—
মরলাম শেষটায় পস্তি ;
স্বস্তি মিলল বোন, অদ্য—
গদ্য-জীবনে চেয়ে কাব্য
ভাববো না আর আমি মিথ্যে,
চিত্তে পাইতে চাই শান্তি।

রাম-মঞ্জুর বোঝাপড়া গেল মায়ের কানে,
হন্তদন্ত ছুটিলেন তিনি সদর-পানে—
হিসাব-খাতায় ডুবিয়া ছিলেন টি. এন. রায়,
গৃহিণীরে দেখি বলিলেন, এ কি—কিসের দায়?

রেগে রায়-জায়া বলেন, ছি-ছি-ছি, নাই কি চোখ।
ছিনু যে আশায়, ছাই প'ল তায়, পাড়ার লোক
বলছে যা খুশি, দোহাই তোমার, ফিরিয়া চাও,
যেমন করিয়া পার মেয়েটার বিবাহ দাও।

মঞ্জু ও রামজয়ে চলে পরামর্শ,
রামজয় শুনে কয় হর-হর শঙ্কর,
নাইকো পরোয়া কোন এ ভারতবর্ষে—
টানিয়া হাজির তারে করিবই আলবৎ—
তুমি শুধু চুপচাপ থাকবে।
বিয়ের কথায় বোন, রাজি হও অদ্য,
জীবনে গদ্য আগে, তারপর পদ্য—
রামজয় ম্লান হাসি হাসলে।

কি যে হল ব্যাপারখানা গেলই-নাকো বোঝা,
যেথায় যত পাত্র ছিল আসতে থাকে সোজা।
তপন-কুটির বেহালার হঠাৎ অবারিত-দ্বার—
পাত্র—সঙ্গে ইয়ার-বন্ধু কিম্বা অভিভাবক—
পাত্রী আসে সেজে-গুজে লিপ্‌স্টিক আর পমেড-রুজে ;
পাত্রেরা সব ভূতে-পাওয়া, পাত্রী যেন রোজা—
হাত-পা নেড়ে নেচে-গেয়ে জমায় আসর বিয়ের মেয়ে,
সিংহীভয়ে পলায় শেষে যতেক মেষ-শাবক।

মঞ্জুর বিয়ে আর হয় না।
জননীর প্রাণে আর সয় না,
করছেন নিত্যই টিকটিক।
কর্তা বলেন, করে চেষ্টা
তোলপাড় করি সারা দেশটা,
একটা তবুও যদি হয় ঠিক!
রামজয় আসছে ও যাচ্ছে,
চা ও পাঁপরভাজা খাচ্ছে।

শঙ্কর হল সেবক-সঙ্ঘে সেক্রেটারি,
ব্রহ্মচারী।
খাতির তাহার ছড়াইয়া পড়ে দিগ্বিদিকে ;
তবুও ফিকে
মাঝে মাঝে ঠেকে, মনে হয় মিছা বিজয়-টীকা,
মঞ্জুলিকা—

কবে যে কোথায় হয়েছিল দেখা সাগর-কূলে,
গিয়েছে ভুলে।

মাঝে-মাঝে মনে পড়ে স্বপ্নে দেখা স্বর্ণময় দিন—
সমুদ্র-মন্থন,
লক্ষ্মী দিয়েছিল দেখা—অন্ধকারে বর্ণরূপহীন
চকিত স্পন্দন ;
যুগান্তরে তন্দ্রাচ্ছন্ন জড়তায় ছিন্নভিন্ন করি
সভয়ে শিহরি
জেগেছিল চরাচর, তারপর হলাহল-জ্বালা,
শঙ্করের পালা।

মঞ্জু কেঁদে মাকে বলে, আমি কি মা এতই হলাম বোঝা।
দেখছি মা গো, তোমাদের যে, কদিন থেকে ঘুম নেইকো মোটে।
অপমান তো অনেক হল, থামাও মা গো, যোগ্য পাত্র খোঁজা,
পায় না যারা কুমার-বরে, ভাগ্যে তাদের দোজবরে তো জোটে।
বাবায় বল দৈনিকেতে একবার মা, দেওয়াও বিজ্ঞাপন—
"দোজবরেকে করবে বিয়ে অমুক পাত্রী এই করেছে পণ।"
খবর যদি ছড়ায়, দেখো, বিয়ে-পাগল আধমরাদের দেশ—
নাচতে জানি, গাইতে জানি, রানীর হালে থাকব সুখে বেশ।

কি যে তুই বলিস খুকি, এতই কি তোর বয়স হল?
বসুবাড়ির ঐ তো রমা, বয়স কুড়ি এবং ষোলো।
রামজয় তো ভালই ছিল, তুই তো বেঁকে দাঁড়ালি মা—।
বলতে-বলতে শ্রীরাম হাজির, এই যে দেখুন খাসা কিমা
এনেছি আজ, মঞ্জু যেন চপ গোটাকয় রাখে ভেজে,
উতোরপাড়ার গোধনবাবুর মেজো ছেলে আসবে সে যে।
দেখতে-শুনতে পাত্রটি বেশ, ছোকরা খাসা 'কমিক' করে।
দোজবরে তো?—বলেই মঞ্জু মুচকে হেসে ঢুকল ঘরে।

শোন বাবা রামজয়,
দোজবরে যদি হয়,
সায়েবে বল কি যে!
ভয়ে আমি ভিজে-ভিজে—
পোড়া এই দেশটায়
রামজয় ভাবে হায়,
চোখে তার আসে জল
দুদিনের এ ধকল

কি যে ছাই মেয়ে কয়—
তবে বিয়ে করবে ;
মঞ্জু বলুক নিজে,
এ মেয়ে কি তরবে?
না জানি কি আরো চায়।
জানে শুধু শঙ্কর,
হেসে বলে খলখল—
নয়কো ভয়ঙ্কর।

দাঁড়ায়ে মায়ের পিছু মাথাটি করিয়া নিচু
ধীরে অতি ধীরে-ধীরে মঞ্জুলিকা কয়,
কুমার বিবাহ করি জীয়ন্তে রয়েছে মরি
মণিদিদি, জান তো সে কি যন্ত্রণা সয়।
আর দেখ পুটুমাসি—মুখ সদা হাসি-হাসি,
গহনা-কাপড়ে নাহি চেনা যায় তারে ;
কোনো সুখ নাই বাকি, দোজবরে বর, তা কি—
তুমি তো মা, জান মোরা কি চাই সংসারে।

লজ্জা হল মায়ের, এবং টি. এন. রায় অবাক।
সে সব কথা থাক—
বিজ্ঞাপন তো বাহির হল সকল দৈনিকে।
দিকে-দিকে-দিকে
চুলবুলিয়ে উঠল ফোকলা-মাড়ি এবং টাক।
ভারী ভারী ডাক
খোলেন শ্রীরাম এবং রাখেন লিস্টি কষে লিখে,
ভুল হয় না ঠিকে।

বললেন রামজয়, ভয় নাই মঞ্জু,
কঞ্জুস তিনু ঘোষে দিতে হবে কিঞ্চিৎ।
তিন চিতে বাজি মাত করবই আলবৎ,
ফালবৎ বাহিরিব ছুঁচে ঢুকি অগ্রে—
সঙ্ঘের শঙ্করে হাত করি পশ্চাৎ
দশ হাত নাকখত দেওয়াইব বৎসে।
মৎস্যে ও দুধুভাতে সুখে থেকো মঞ্জু,
কঞ্জুস তিনু ঘোষে দিতে হবে কিঞ্চিৎ।

শুভ বিবাহের রাত্রি,
সঙ্গে লয়ে বরযাত্রী
আসিলেন বেহালায়
মা করেন, হায়-হায়,
রামজয়-অনুরোধে
নিতান্ত কর্তব্য-বোধে,
মৃত্যুপথযাত্রী বর
ধুঁকিতেছে ভয়ঙ্কর,

সাজিয়া-গুজিয়া তিনু ঘোষ।
গায়ে দিয়ে নয়া বালাপোষ
মাঝরাতে তপন-কুটিরে,
বুক ভাসে নয়নের নীরে।
শঙ্কর সে আসিয়াছে নিজে
আঁখিপাতা তবু ভিজে-ভিজে।
খুকখুক কাশে অবিরাম,
মঞ্জুর কি এই পরিণাম?

পিঁড়েয় বসে ভির্মি লেগে পড়ল ঘুরে বর,
কেউ হাঁকিল—আন্‌ খাটিয়া, কেউ—নে পাখা কর্‌।

বরকর্তা বলেন কেঁদে, এমন অবস্থায়
হাসপাতালে দেওয়াই ভালো, নইলে বাঁচা দায়।
অ্যাম্বুলেন্সে খবর কে যে দিলেন টেলিফোনে,
এমন সময় আলুথালু স্বয়ং বিয়ের কনে
বললে কেঁদে, সবুর করুন, বিয়েটা হোক শেষ,
নইলে যাবে জাত আমাদের, দেশটা বাংলা দেশ।

ঘর্মে ভিজিয়া গেছে পাঞ্জাবি খদ্দর,
শঙ্কর কলকল ঘামছে—
আর্ত এ ক্রন্দন অসহায় বধ্যর
শিরে যার গিলটিন নামছে।
শঙ্কর ওঠে এক লম্ফে,
শঙ্কর খুলে ফেলে খদ্দর,
মঞ্জুর কাছে গিয়ে বলে, তুমি দাও প্রিয়ে,
দুর্জনে কামড়ে ও খামচে।

শঙ্কব পরিলেন বরবেশ,
সার্থক তপস্যা গৌরীর।
রামজয় গেলে খালি দরবেশ,
তিনু ঘোষ শরবত মৌরির।
শ্রীতিনুর অভিনয় সুন্দর,
ছেড়ে দেয় কিঞ্চিৎ প্রাপ্য ;
রাম যায় বোম্বাই বন্দর—
এইবার গল্প সমাপ্য।

ক্ষমা কর দিবসের সূর্য,
ক্ষমা কর নিশীথের চন্দ্র ;
বাজে মহামিলনের তূর্য,
সংগীত স্বরে মেঘমন্দ্র।
ত্রিভুবন আজ উৎফুল্ল,
এক হল দুই উদ্‌ভ্রান্তে,
ভঙ্গুর জীবনের মূল্য
একলাটি কে পেরেছে জানতে?

কেড্‌স ও স্যান্ডাল

কেড্‌স একজোড়া, একজোড়া স্যান্ডাল—
কেড্‌স সে 'বাটা'র, স্যান্ডাল-জোড়া 'ডেস্কো' হইতে কেনা,
সাদা চামড়ার উপরে সাঁচ্চা জরি।

বালিগঞ্জের পার্কের ধারে নূতন দোতলা বাড়ি ;
লাল একজোড়া ঠনঠনিয়ার শুঁড়-তোলা চটিজুতা
রাতদিন সেথা থাকে।
লাল-পাড়-ঢাকা খালি-পা আরেক জোড়া।

সাড়ে আটটায় আসে কলেজের বাস,
ফিটফাট সেই স্যান্ডাল-জোড়া পথের বারান্দায়
পায়চারি করে, অধীর তাহার ভাব।
বাস আসে আর স্যাণ্ডাল ওঠে বাসের পা-দানি দিয়ে।
কলেজে পৌঁছে নেমে যায়—নেমে ঢোকে বটানির ক্লাসে,
রবিবার শুধু বাদ।

কেড্‌স-জোড়া আসে এল্‌গিন রোড হতে।
কভু ঠিক সন্ধ্যায়,
ঝড়-জলে আসে, কখনো দুপুর-রোদে ;
ভিজে কালো কভু, কখনো ব্রস্কো মেখে
খটখটে যেন শরতের রোদ সাদা ধবধব করে।

প্রথম যখন এল এই কেড্‌স-জোড়া—
সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠিত বারান্দায়,
চুপ করে সেথা খানিক দাঁড়াত সঙ্কোচে-ভয়ে যেন,
শোনা যেত কাঠে শিকলের ঝনঝন।
খুলিত দরজা স্যান্ডাল-জোড়া নয়—
হেজে-যাওয়া ফাটা খালি-পা আরেক জোড়া।
খালি-পা চলিয়া যেত।

বাহিরের ঘরে চেয়ারের তলে কেড্‌স আড়াআড়ি থেকে—
স্যান্ডাল এসে নিয়ে যেত তারে ভিতরে পড়ার ঘরে।
এক টেবিলের নিচে
পরিচয়হীন কেড্‌স-স্যান্ডাল থাকিত যে চুপচাপ,
নড়িত-চড়িত কভু ;
সে নড়াচড়ায় ছোঁয়াছুঁয়ি তবু হত না একটি দিনও।

মাঝে-মাঝে সেথা ঠনঠনিয়ার শুঁড়-তোলা চটি-জোড়া
দাঁড়াত ক্ষণেক, লাল-পাড়-ঢাকা পা-জোড়া আসিত কভু।

গোড়ায়-গোড়ায় হপ্তায় তিনদিন—
তার পরে যত দিন যায় কেড্স আসে আরো ঘন-ঘন,
আজকাল আসে রোজই ;
বারান্দা দিয়ে দরজার মুখে দাঁড়াতে হয় না তারে।
স্যান্ডাল এসে খোলা দরজার পথে
বহু সমাদরে কেড্সে লইয়া যায়।
দেরি হলে তার ছটফট করে দোতলা বারান্দাতে—
এলোমেলোভাবে সিমেন্ট ছুঁইয়া চলে।

সটান পড়ার ঘরে।
সেথা টেবিলের নিচে
স্যান্ডাল আর কেড্সে যেন সে চলে চুমা খাওয়া-খাওয়ি।
কেড্স একপাটি, স্যান্ডাল একপাটি—
সে যেন বিষম লণ্ডভণ্ড ভাব।

টেবিলের তলা ছেড়ে মাঝে-মাঝে স্যান্ডাল উঠে যায়।
মাঝের দরজাতক—
চুপিচুপি গিয়ে ফিরে আসে চুপিচুপি,
দেখে আসে কোথা শুঁড়-তোলা সেই ঠনঠনিয়ার চটি,
—ইজি-চেয়ারের তলে।

আরো যায় কিছুদিন,
স্যান্ডাল আর কেড্সজোড়া যায় প্রায় সন্ধ্যার মুখে
কখনো পার্কে, কখনো ঢাকুরে লেকে,
কখনো বায়োস্কোপে।
লাল-পাড়-ঢাকা খালি-পার সাথে মার্কেটে কভু যায়,
শুঁড়-তোলা চটিজুতা—
ইজি-চেয়ারের তলায় অতীব আরামে পড়িয়া থাকে।

বলিব গ্রহের ফের—
একদা দুপুরে দেখা গেল সেই পুরানো পড়ার ঘরে
কেড্স-স্যান্ডাল টেবিলের তলে নাই—
উপরে শোবার ঘরে
খাটের নিচেতে জুতা দুইজোড়া পড়ে আছে চুপচাপ,
ভয়ে যেন উসুখুসু।

এমন সময়ে হঠাৎ কি জানি কেন—
দেখা গেল আসে শুঁড়-তোলা চটি চৌকাঠ পার হয়ে।
কি যে ঘটে গেল এক-নিমেষের মাঝে,
হেজে-যাওয়া ফাটা পা-জোড়া ছুটিয়া এল,
ছুটে এল লাল-পাড়—
কেড্‌স দ্রুতগতি বাহিরে যাইতে চায়—
শুঁড-তোলা চটি কেড্‌সের 'পরে পড়ে একপাটি এসে,
সিঁড়ি দিয়ে কেড্‌স নামে তরতর করি,
খিড়কি-দুয়ার খুলে
বাহির হতেই সোজা অ্যাভিনিউ রোড।
উপরে শোবার ঘরে
নড়ে না চড়ে না স্যাণ্ডাল বহুক্ষণ।

দিন—দিন—মাস যায় ;
কেড্‌স সে আসে না এই পথ দিয়ে আর ;
কলেজের বাস আসে আর ফিরে যায়,
স্যাণ্ডাল ঘরে থাকে।

তারো পরে একদিন,
শোবার ঘরেই স্যাণ্ডাল আছে, পাড়-ঢাকা পা দু-খানি
ধীরে-ধীরে-ধীরে আসিল তাহার কাছে ;
মিনিট বিশেক পরে
স্যাণ্ডাল যেন পড়িতে-পড়িতে ছুটিয়া বাহিরে চলে।

তিন-চারদিন যায়।
বিকাল পাঁচটা অথবা ছয়টা হবে,
মোটর একটা হর্ন দিয়ে-দিয়ে থামে দরজার পাশে—
বাহিরে আসিল শাড়ি-ঢাকা পদযুগ—
মোটর হইতে নামে একে-একে স্যাণ্ডাল পাঁচজোড়া,
কমল ব্রাদার্স, বেঙ্গল স্টোর্স, কোনটা মন্নু ব্রস—
লীলায় চপল নহে,
ভারী-ভারী যেন বয়েসে এবং জ্ঞানে।
পাঁচজোড়াকেই লাল-পাড় শাড়ি দোতলায় নিয়ে যায়,
কার্পেট পাতা সেখানে বারান্দায়—
আড়ালে কোণের দিকে,
জটলা করে স্যাণ্ডাল পাঁচজোড়া—
এ উহার ঘাড়ে—সাড়ে বত্রিশ ভাজা।

অর্ধঘণ্টা পরে—
ডেস্কোর সেই স্যান্ডাল-জোড়া নয়,
আলতা-রঙিন অপরূপ পদযুগ
মৃদু-মৃদু এসে দাঁড়াল, কাঁপিল ভয়ে,
গেল যে সুমুখ দিয়ে—
কাঁদিয়া-কাঁদিয়া গেল যেন অভিমানে।
মোটরে চড়িয়া ফিরে চলে গেল পাঁচজোড়া স্যান্ডাল।

আরো গেল দশদিন।
পড়ার ঘরেতে স্যান্ডাল-জোড়া, মলিন হয়েছে জরি।
এল সম্মুখে ফাটা-হাজা পা-যুগল,
দাঁড়ায়ে খানিক চলে যায় যেন চুরি করি ভয়ে-ভয়ে—
খিড়কির চৌকাঠ
পার হয়ে গেল যেথা রাস্তায় দাঁড়ায়ে লেটার-বক্স।

সেদিন দুপুরবেলা—
হল উৎসব-চঞ্চল যেন শান্ত সে বাড়িখানা—
বাহিরে সানাই বাজে।

ভোর হতে সেথা কত জুতা আসে-যায়—
চটি ও স্লিপার, অ্যালবার্ট, নিউকাট,
সেলিম অথবা অক্সফোর্ড জোড়া-জোড়া ;
ঠিকানা ভুলিয়া এদিক-ওদিক সরে।
হোগলার চাল ছাতেতে হয়েছে বাঁধা।
ছাতের সিঁড়ির উপরের ধাপটায়
জুতায়-জুতায় চাপাচাপি হয়ে জড়াজড়ি করে, যেন
ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কোন পাদুকা-প্রদর্শনী।

দোতলার ঘরে সিঁড়ির সমুখে ঠিক,
স্যান্ডাল আর স্যান্ডাল আর স্যান্ডাল কত জোড়া।
এখানে সেখানে হলুদের ছড়াছড়ি—
রঙ ছড়াছড়ি দেয়ালে-মেঝেতে শাড়িতে-জুতাতে আর।
শুঁড়-তোলা সেই ঠনঠনিয়ার চটি
এতদিন পরে নাচিয়া-কুঁদিয়া ফেরে।

সন্ধ্যার কাছাকাছি,
কেড্‌স-জোড়া এসে দাঁড়াইল ঠিক খিড়কি-দুয়ার-মুখে।

হাজা-পা খবর দিতে
স্যান্ডাল-জোড়া অতি সন্তর্পণে
আসিল বাহিরে, নাই সেই লঘু গতি,
কত ভারে যেন ভারী হয়ে গেছে ডেস্কোর স্যান্ডাল।
আবছা আঁধার গলি,
দাঁড়াইয়া ছিল ট্যাক্সি সিডান-বডি—
কেড্স-স্যান্ডাল তাহাতে চড়িয়া বসে।
রাত্রি দশটা হবে,
দুইজোড়া জুতা নামিল আসিয়া ঢাকুরে লেকের ধারে,
দক্ষিণে যেথা দু-খানি গাছের ফাঁকে
এক-খানি বেঞ্চ, তাহারই তলায় জোড়া স্যান্ডাল-কেড্স—
সুবিধা থাকিলে ফেটে যেত বেদনায়।

পাশ দিয়ে কত জোড়া-জোড়া জুতা এল আর গেল চলে—
লোভে লোভে গেল, হেসে হেসে গেল চলে।
রাত যত বাড়ে জুতার শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে,
একেবারে চুপচাপ।
কেড্স-স্যান্ডাল ভিজা ঘাসে-ঘাসে পাশে-পাশে হেঁটে চলে,
ভিজে-ভিজে ভারী হয়।

ঠনঠনিয়ার শুঁড়-তোলা চটিজোড়া
ফটফট করে—থানা ও হাসপাতাল,
হাওড়া-শিয়ালদায়।
পাড়-ঢাকা সেই পা-দুখানি মরে কেঁদে।

পরদিন খুব ভোরে
পেটেন্ট-লেদার অতি শৌখিন অ্যাল্‌বার্ট একজোড়া
অবাক হইয়া দেখিলেন, ঠিক লেকের জলের ধারে
কাদা মাখামাখি পড়িয়া রয়েছে খালি জুতা দুইজোড়া,
বাটা হতে কেড্স, ডেস্কোর স্যান্ডাল।
এদিক-ওদিক দেখিলেন ভয়ে-ভয়ে,
দুইজোড়া জুতা কাঁদিছে কাদায়, আর কোথা কেহ নাই।

ঠনঠনিয়ার শুঁড়-তোলা জুতা, শুঁড় আরো গেছে বেঁকে,
লেকের ধারেতে কাঁদে ঠনঠনে চটি।

পঁচিশে বৈশাখ
১৯৪২

মর্ত্য হইতে বিদায়

বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?
অরণ্যভূমি আঁধার করিয়া শতেক বর্ষ ধরি
শাখাপ্রশাখায় মেলি সহস্র বাহু
মৃত্তিকারস করিয়া শোষণ শিকড়ের পাকে-পাকে
নিম্নে বিরচি বহুবিস্তৃত স্নেহছায়া-আশ্রয়—
অভ্রংলিহ বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?

সারা দেহ জুড়ি প্রদোষে-উষায় নভচারী পাখিদের
কূজন ও কোলাহল—
স্তিমিত আলোয় উড়িয়া ক্লান্ত পক্ষের বিধূনন,
ভোরের আঁধারে দীপ্ত আশায় ডানা ঝাপটিয়া জাগা।
নীড়ে ও কুলায়ে প্রাণস্পন্দনে চকিত বিচঞ্চল—
বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?

অরণ্যশোভা বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?
পাদদেশে তার শতসহস্র পাদপ-সম্ভাবনা
খর্বায়তন লতাগুল্মের বিফল বিকারে হত।
রৌদ্রপুষ্ট সবুজ কোথায়? পাণ্ডুর বনতল—
বনস্পতির মৃত্যুতে তারা পেয়েছে মুক্তি সবে?
উদার আকাশে মেলিয়া অযুত বাহু
হয়েছে উতলা বিস্তার-কামনায়,
বনস্পতির বিহনে বনে কি দ্রুমিছে এরণ্ডেরা?

লালসালোলুপ দৃষ্টি এখনি জাগিছে কাহারো চোখে?
কোনো বঞ্চিত, ওষ্ঠে তাহার ফুটিছে মলিন হাসি—
জীবনের লোভে মৃত্যুশীতল হাসি;
তবু আমি জানি আশ্রয়হারা কাঁদিতেছে বনভূমি,
অভ্যাসবশে বনস্পতির নিবিড় চন্দ্রাতপ
কামনা করিছে সবে।

ধূসর রৌদ্র ভালো নাহি লাগে, আকাশের গাঢ় নীল ;
বনস্পতির মহিমায় আজো কানন আত্মহারা।
একের মাঝারে সবার সার্থকতা,
অদ্বিতীয় সে একের বিয়োগে বহুর যে কাতরতা
পেতেছে প্রকাশ নয়নে বাষ্প হয়ে,
রৌদ্রদগ্ধ নভপ্রাঙ্গণ করিছে মেঘমেদুর—
রহি-রহি আজো ধারাবর্ষণে ঝরিছে অবিশ্রাম ;
লতাগুল্মের অরণ্যে হের ঝঞ্ঝার মাতামাতি,
মাথার উপরে আশ্রয় কারো নাই ;
কাননভূমির চির-আশ্রয় একক বনস্পতি—
বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?

বিফল উপমা, কোথা অরণ্য, কোথায় বনস্পতি,
কোথা কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখরে কবি—
কোথায় উজ্জয়িনী?
শুধু মেঘদূত গগনে-গগনে গুমরিছে গুরু-গুরু,
পবনে করিয়া ভর
কালসমুদ্র পার হয়ে এল সহস্র বর্ষের।
শত-পারাবত-কূজন-মুখর ভবনবলভি যত
মিশেছে ধুলায়, শুনিতেছি মোরা আজো—
কপোতকাকলি এ কলিকাতায় অলস মধ্যদিনে।

হায় রে উপমা, বিফল উপমা যত!
সকল উপমা হারাইয়া গেছে কাল-তমসার নীরে।
হায়, 'বলাকা'র কবি,
বাঁকা ঝিলমের দুই তীর ব্যাপি নেমেছে অন্ধকার,
জমেছে আঁধার নিরবধি চলা "বিরাট নদী"র জলে!

তুষারমৌলি নগ-অধিরাজ দেখিয়াছি হিমালয়,
স্থিত পৃথিবীর মানদণ্ডের মত—
পূজিয়াছি হিমালয়ে।
যত দেখিয়াছি, ততো করিয়াছি বিস্ময় অনুভব।
ভূমিকম্পের প্রবল তাড়নে সহসা কি একদিন
চৌচির হয়ে ফাটিয়া পড়িতে দেখিয়াছ হিমালয়ে?
সহস্রশির বিরাট নগাধিরাজে
গুঁড়া-গুঁড়া হয়ে ভাঙিয়া পড়িতে তোমরা দেখেছ কেউ?
আকাশ-আড়াল-করা ব্যবধান একদা নিশীথশেষে

চকিতে দেখেছ বাতাসে উড়িয়া গেছে?
সহসা দেখেছ বিস্মিত আঁখি মেলে
হিমালয় নাই, ধুধু করিতেছে সীমাহীন প্রান্তর,
ধুধু করিতেছে বালি-ঝলসানো সুবিশাল মরুভূমি—
মরীচিকাহীন ভয়াবহ মরুভূমি?

মহা-হিমালয়ে ভাঙিতে দেখেছ কেউ?
পাদমূলসহ দেবতা-আত্মা হিমচূড়া হিমালয়ে
মৃত্যুর মত কালো কুয়াশায় ঢাকিতে দেখেছ কেউ?
রবির উদয়ে যে কুয়াশা কভু শূন্যে মিলাবেনাকো,
যে কুয়াশা ছেদি হাসিবে না হিমালয় ;
সুনীল আকাশপটে কোনদিন তুষারশীর্ষ গিরি
জাগিবে না আর—কারো মনে এই জেগেছে সম্ভাবনা,
কঠিন সম্ভাবনা?
ভাঙিতে কেহ কি দেখিয়াছ হিমালয়ে?

বিফল উপমা, কোথা হিমালয় নদীগুহা-আশ্রয়,
কোথা কালিদাস রঘুকুমারের কবি?
চিতার ভস্ম উড়িছে কি আজো রোদনমুখর
রেবামালিনীর কূলে,
স্মৃতিমন্দির উঠেছে কি কোনো, প্রভাতবেলায়
পুণ্যলোভীরা সবে
চন্দনমাখা শুভ্রকুসুম উদ্দেশে তাঁর দিতেছে শ্রদ্ধাভরে?
হরপার্বতী-মিলনকাহিনী সুরসিক-জন পড়িতেছে
যুগে-যুগে,
কুতূহলী মোরা পড়ি অবকাশকালে—
ঘরে-ঘরে সবে করি যে কামনা কুমার কার্তিকেয়ে ;
বৈদেহী সাথে ফিরিছে রাঘব শূন্য বিমান-পথে,
আজো দেখি মনে সেই পুরাতন ছবি—
কলকোলাহল-মুখরিত এই নগর কলিকাতায়।
হায় রে উপমা, বিফল উপমা যত,
সকল উপমা হারাইয়া যায় ক্ষণিকের খেলাঘরে ;
হায়, 'ক্ষণিকা'র কবি,
আঁধার নেমেছে "কৃষ্ণকলি"র হরিণনয়ন ছেয়ে,
নেমেছে আঁধার "ময়নাপাড়ার মাঠে"।

* * *

পূর্ণিমাচাঁদ দেখিনি ডুবিতে, আঁধার শ্রাবণনিশি—
শুনিয়াছিলাম শঙ্খঘণ্টারোল,
মেঘগর্জন-অবকাশে মোরা শুনেছিনু সকলেই
ঝুলন-পৌর্ণমাসী রজনীতে সঘন শঙ্খরব ;
বরষাবিদ্ধ তন্দ্রামগ্ন নগরী সে কলিকাতা,
চিৎপুর রোডে বন্ধ হয়েছে যানবাহনের চলা,
মেঘের আড়ালে দেখিনু সহসা হাসিল শারদশশী।

তীর্থযাত্রী একেলা পথিক বৈতরণীর তীরে
সম্বলহীন, তাই তো শঙ্কাহীন—
ওপারে চাহিয়া এপারের ছবি দেখিছে পথিক
ধ্যাননিমীলিত চোখে,
এপারের রবি ওপারে ডুবিতে চায়,
এপারে-ওপারে আমাদের মাঝে দুস্তর পারাবার।

মহামানবের প্রাণ—
মানবের মাঝে চিরজীবী প্রাণ, সুন্দর ত্রিভুবন,
জীর্ণ খাঁচায় আজ পলাতক মরণোন্মুখ প্রাণ,
ভুবনের রূপ চির-অমলিন—তবুও বিবাগী প্রাণ,
শিয়রে তাঁহার জাগিছে কয়টি প্রাণী।
জাগে আর তারা প্রতীক্ষা করে নিশ্বাস গুনে-গুনে,
প্রতীক্ষা করে নিশ্বাস রোধ করি,
প্রহর গনিয়া প্রতীক্ষা করে সবে।
শ্রাবণরজনী শিথিলচরণে প্রখর রৌদ্রে কখন আত্মহারা,
প্রভাত হইল রাখী-পূর্ণিমা-দিন,
মাটির ধরণী রাখিতে নারিল তবু
বিদায়প্রার্থী বিবাগী সন্তানেরে।
দূর হতে দেখি জীবনের বুকে মৃত্যুর নিশ্বাস
ওঠে আর ভেঙে পড়ে।
সুশুভ্রফেনশীর্ষ বারিধি মেলি তরঙ্গবাহু
অভ্যাসবশে তটেরে ধরিতে চায়—
মিথ্যা সে খেলা, আমি জানি তার গভীরেতে অনুরাগ।
বিদায়-বারতা শুধু নিশ্বাসে—শান্ত ললাট-পট,
পাণ্ডু ওষ্ঠে স্ফুরে না বিদায়গান ;
পিছু ফিরিবার নাহি কোনো ব্যাকুলতা,
"যাবার বেলায় পিছু ডাকিবার" ছিল না সেদিন কেউ।

সে মহাপ্রাণের শিয়রে জাগিয়া কটি অসহায় প্রাণী—
মূঢ় বিস্ময়ে সহসা দেখিল তারা—
দেখিল সহসা দ্বারে জনতার ভিড়।
মাটির পৃথিবী চঞ্চল হয়ে বাহু বুঝি মেলিয়াছে—
বিদায়প্রার্থী রাখিতে সন্তানেরে ;
তখন সময় নাই।
আকাশে বাতাসে শুধু শোনা যায় অস্ফুট কানাকানি,
প্রাণমৃত্যুর চিররহস্য-কথা—
নিগূঢ় গোপন কথা।
মৃত্যুর কথা কেহ বলিল না, "বারোটা তেরো মিনিট",
কণ্ঠে-কণ্ঠে অতি অসময়ে সময়ের পরিমাপ,
মহাকাল-গতি চকিতে থামিল যেন—
এপারে-ওপারে ঘুচে গেল ব্যবধান,
প্রাণমৃত্যুর সব রহস্য শেষ!
আসিল পরম ক্ষণ—
সারা বনভূমি আলোড়ন করি মরিল বনস্পতি,
ভেঙে গেল হিমালয়।

মৃত্যুরে যেবা প্রলুব্ধ করি ডাক দিয়েছিল অর্ধ শতক ধরি
মৃত্যু তাহারে নিয়ে গেল শেষাশেষি ;
নিয়ে গেল ভালোবেসে—
রক্ত-অধর নিবিড় চুমায় পাণ্ডুর হল কি না
হিসাব তাহার পারেনি রাখিতে কেউ।
গোধূলি-লগনে যায়নি পথিক স্তিমিত অন্ধকারে,
পাখিরা তখনো ফিরে আসে নাই নীড়ে।
দিনের রৌদ্র যখন প্রখরতম
মর্ত্য হইতে বিদায়-বারতা রটিল মর্ত্যভূমে,
মর্ত্য-মানব মোরা—
"স্বর্গ হইতে বিদায়ে"র কবি—নিমীল তাঁহার চোখে
বিদায়-অশ্রু কেহ কি দেখিয়াছিল?
হায় কবি, হায়, সুন্দর ত্রিভুবন!

স্তম্ভিত ভয়ে শুনেছিনু সবে আর্ত ঘোষণা সেই,
আকাশের পানে তুলিয়া চকিতে শত উৎসুক আঁখি
দেখেছিনু সবে খর-রবিকরে নিখিল পুড়িয়া যায়,
অকরুণ নীলাকাশ।

মৃত্যু, মরণ, সমাপ্তি, শেষ, বিদায় চিরন্তন—
কাব্যের ভাষা যাহাই বলুক, নিঃশেষে শেষ হওয়া
সকল দেহীর মত—
অমর কবির চরম সে পরিণাম
স্তব্ধ হইয়া শুনিলাম কানে শ্রাবণ-দ্বিপ্রহরে,
বিস্ময়ে দেখিলাম,
নিশ্চল দেহে সকল জ্বালার শেষ।

সুতীব্র কশাঘাতে—
অলক্ষ্য সেই অকরুণ কশাঘাতে
দেহে-মনে যেন উঠিনু চকিত হয়ে,
চিৎকার করি বলিবারে চাহিলাম—
বলিতে চাহিনু চরম অবিশ্বাসে,
"মর্ত্ত্য-মানব মোরা—
ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলেই অসহায়,
ধ্বংস জরার ক্রূর হাত হতে নিস্তার কারো নাই।"
ক্ষণ-বিস্মৃতি—ক্রোধে-বেদনায় চাহি অপলক চোখে
পাগলের মত চাহি বিহ্বল চোখে
দেখিনু মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখখানি—
প্রশান্ত মুখে দুটি অপলক আঁখি,
আয়ত নয়নে দৃষ্টি কেবল নাই।
যে আঁখি একদা সূর্যের মত জ্বলিত দীপ্ত তেজে
জ্বলিত তীক্ষ্ণ তেজে—
সন্ধানী আলো—চকিতে দেখিত গোপন মর্মতল,
বিশ্বের ব্যথা জমাট বাঁধিয়া কালো সে গভীর চোখে,
দৃষ্টির লেশ নাই।

কি যে হল মনে, বিহ্বল ক্ষণে কল্পনা অদ্ভুত,
মৃতের বধির শ্রবণে চাহিনু শোনাতে আর্তস্বরে—
"চাও আঁখি মেলি, কথা কও কও মর্ত্ত্যের সন্তান,
আমরা মর্ত্ত্যবাসী
ডাকিতেছি সবে, নয়ন মেলিয়া চাও।"
মনে-মনে ডাকিলাম—
ঘরের বাতাস ভারী হয়ে এল, কেহ শুনিল না কানে।
মর্ত্ত্যের কবি, চিরজীবী কবি, কখন অকস্মাৎ
মলিন মর্ত্ত্য হইতে বিদায় নিয়েছে অনিচ্ছায়।

সুন্দর এ ভুবন—
ভুবন ছাড়িয়া ভুবনের কবি গিয়াছে পরম ক্ষণে।

* * *

বিমূঢ় স্তব্ধ দেখিলাম চেয়ে নিবেছে দিনের আলো—
মেঘে-মেঘে কালো গাঢ় আকাশের নীল।
মানুষের কাঁধে-কাঁধে চলে গেল মৃত মানবের দেহ,
পাবক-অগ্নি জ্বলে জাহ্নবীতীরে,
জ্বলিছে রাত্রিদিন।

* * *

অন্ধকারেতে সভয় চরণ ফেলিয়া এলাম ঘরে—
আমার রুদ্ধ ঘরে ;
সম্বিৎহারা, সম্বিৎ পেনু ফিরে—
প্রসন্ন আঁখি মেলি দেখিলাম, আমার ঘরের কোণে
স্নিগ্ধ শিখায় জ্বলিতেছে ঘৃতদীপ ;
চিতার আগুন ঘরের প্রদীপে কখন ছুঁইয়া গেছে—
ছুঁয়েছে পরম স্নেহে।
দ্বিধা-কম্পিত দুই করতল এক হল আশ্বাসে,
বলিতে পারি না কোন্ দেবতারে ঘৃতদীপ-মহিমায়
নিবেদিনু নতি চরম নমস্কারে।

১৯ ভাদ্র, ১৩৪৮

'ক্ষণিকা'

আজ সকালে হঠাৎ হল নতুন পরিচয়—
পেলেম দেখা বিশ্বকবি, তোমার 'ক্ষণিকা'র,
চৌদিকেতে ঘনিয়ে যখন আসছে মরণভয়—
ফাটছে বোমা, বুকের মাঝে শুনছি ধ্বনি তার,
আতঙ্কে মন চমকে ওঠে,
জটলা পাকাই ভয়ের চোটে,
কখন জানি লাগেই আঘাত লৌহ-কণিকার।

কাব্য তোমার ঝলমলিয়ে উঠল কালো মেঘে,
গুমট ঘরে ফুটল মরণ-তুচ্ছ-করা হাসি ;

মনের মধ্যে খ্যাপারা সব উঠল হঠাৎ জেগে—
শুনতে পেলাম উজান-বহা কোন্ যমুনার বাঁশি।
ভয়-ভাবনা গেল ভেসে,
মন ছুটে যায় নিরুদ্দেশে,
যেথায় তাদের নিবাস যাদের আমরা ভালোবাসি।

মহাকাব্য লেখনি তায় হয়নি কোন ক্ষতি,
মহৎ কাব্য হচ্ছে জড়ো হালকা কথার মাঝে—
সীতায় না হয় হারিয়েছিলেন ত্রেতার রঘুপতি,
তোমার কাব্য বুকে মোদের সমান সুরে বাজে।
তোমার চটুল ছন্দে কবি,
ছলকে ওঠে ব্যথার ছবি,
হাসির ছবি চমক হানে, কান্না মরে লাজে।

প্রতিদিনের মহাকাব্য তোমার কাব্যখানি—
বাইরে প্রকাশ পায় যে কবি, হাসির কাব্য হয়ে ;
পাকছে যখন চুলের গোড়া, হাসির মুখোশ টানি
চিরদিনের সত্য কথা ছন্দে গেছ কয়ে।
ক্ষণিক হাসির অন্তরালে
পরাও টিকা মোদের ভালে,
চমকে উঠি ক্ষণে-ক্ষণে আপন পরিচয়ে।

প্রতিদিনের কাব্য তোমার তাই তো চিরন্তন—
উপলমুখর ঝরনা সে যে সাগর পানেই ধায় ;
ত্রেতার নহে, রামের নহে, মোদের রামায়ণ
রইল লেখা বিশ্বকবি, তোমার 'ক্ষণিকা'য়—
মোদের পুলক-অশ্রুধারা,
ছন্দে গাঁথা রইল তারা—
ক্ষণিক কাব্য নিত্য মোদের আশা-আশঙ্কায়।

লাগল ভালো আজ সকালে চপল কাব্যপাঠ,
ক্ষণিকের এই খেলাঘরে তোমায় স্মরণ করি,
ভয়টা কিসের, ভাঙে ভাঙুক পুরাতনের ঠাট,
দুঃখ কিসের, হঠাৎ যদি থামেই বুকের ঘড়ি!
বাজে বাজুক বিদায়-বাঁশি,
তাই বলে কি থামবে হাসি!
ঝড়ঝাপটে বাদলা-রাতে চলবে খেয়াতরী।

১৪ মাঘ, ১৩৪৮

পঁচিশে বৈশাখ

পুন এল পঁচিশে বৈশাখ।

একাশি বছর আগে এইদিন এসেছিল এমনি অস্থির
সমারোহে—
"নটলীলা-বিধাতার নব নাট্যভূমে উঠে গেল যবনিকা।
শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী
স্পর্শ দিল একপ্রান্তে স্তম্ভিত বিপুল অন্ধকারে,
আলোকের থরহর শিহরণ চমকি-চমকি
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে অসীম তন্দ্রার স্তূপে-স্তূপে,
দীর্ণ-দীর্ণ করি-দিল তারে।
গ্রীষ্মরিক্ত অবলুপ্ত নদীপথে অকস্মাৎ প্লাবনের দুরন্ত ধারায়
বন্যার প্রথম নৃত্য শুষ্কতার বক্ষে বিসর্পিয়া
ধায় যথা শাখায়-শাখায় ;—
সেইমতো জাগরণ শূন্য আঁধারের গূঢ় নাড়িতে-নাড়িতে,
অন্তঃশীলা জ্যোতির্ধারা দিল প্রবাহিয়া।"
তুমি এলে ধরণীর কোলে।
ধ্বনিল মঙ্গল-শঙ্খ উদয়-দিগন্তে সেইদিন,
দিল ডাক চির-নূতনেরে,
অক্ষয় যৌবনে দিল ডাক।
ব্যথায় বিবশক্লান্ত সেদিনের ব্যাকুলা প্রকৃতি
আপনার গর্ভগৃহে অম্লান সুন্দরে দিল ডাক।
চৈত্রের জড়তা-শেষে এল শুদ্ধ পঁচিশে বৈশাখ।

পুন এল পঁচিশে বৈশাখ।

বর্ষে-বর্ষে এইদিন এল, গেল চলে ;
তুমি বার-বার
আশিটি বছর ধরি ধরণীর আশীর্বাদ করিলে গ্রহণ।
জীবনের পানপাত্র পূর্ণ করি নিশ্বাসে-নিশ্বাসে
আকণ্ঠ করিলে পান মর্ত্যের অমৃতরসধারা ;
শুভ জন্মদিনে তব বারংবার করিলে বন্দনা
নানা ছন্দে-কবিতায়-গানে।
প্রশান্ত নির্লিপ্ত প্রাণে সমাপ্তি সন্ধান করি জীবনের কর্ম
অবসানে
প্রতি বর্ষে আপনারে করিলে প্রস্তুত।

তারপর একদিন বাইশে শ্রাবণ এল ঝুলন-পূর্ণিমা-
নিশি-শেষে,
শান্ত চিত্তে নত নেত্রে পরিচিত পৃথিবীর বক্ষ হতে লইলে
বিদায় ;
এল নিমন্ত্রণ তব, ধরণীর কবি,
অজানা নেপথ্যলোকে বিরাটের ছায়াসন-তলে ;
"পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা"
পশ্চাতে ফেলিয়া রাখি রিক্ত হস্তে গেলে সেইদিন
নূতন জীবনচ্ছবি বিরচিতে আববার শূন্য দিগন্তের

পুন এল পঁচিশে বৈশাখ।

একাশি বছর পরে আসিল প্রথম আজ
তুমি-রিক্ত পঁচিশে বৈশাখ,
বাইশে শ্রাবণ আসি খণ্ডিত করিয়া গেল
হর্ষোচ্ছল পঁচিশে বৈশাখে।
তবু এল পঁচিশে বৈশাখ।

পুন এল পঁচিশে বৈশাখ.

প্রত্যক্ষ উৎসব হল আমাদের স্মরণ-উৎসব।
কালাতীত মহাকাল রাখিল চিহ্নিত করি বৈশাখের
একটি দিবস
অনাগত দিবসের মানবের লাগি।
তারা ভাগ্যবান,
বরণ করিবে তারা বর্ষে-বর্ষে পঁচিশে বৈশাখে।
তাহাদের আনন্দ-উৎসব
কভু করিবে না ম্লান আমাদের বিয়োগ-বেদনা।
শুভ এ স্মরণ-দিনে তারা শুধু স্মরিবে কবিরে ;
তাহাদের লাগি
যাহা রেখে গেছ তুমি ছন্দে-গানে গেঁথে,
সেদিনের সভাতলে উল্লাসে করিয়া পাঠ চিনিবে কবিরে,
লভিবে তাহার সনে সামান্য-মোদেরো পরিচয়—
মহতের সংস্রবের এই লাভ শুধু আমাদেরি।
মোরা সেই আনন্দে আজিকে
সাগ্রহে বরণ করি অনাগত পঁচিশে বৈশাখে।

২৫ বৈশাখ, ১৩৪৯·

কদাচ মত্ততা আসে আমাদের মামুলি জীবনে ;
ভুলে গিয়ে আপনার সুখ-দুঃখ অভাব-বেদনা,
ধরণীর ধূলিধূম্র ভুলে গিয়ে ক্ষণ-বিস্মরণে
অসীম উদার নভে থরে-থরে কুসুম-রচনা।
আমাদের চারিদিকে ক্ষুব্ধ সিন্ধু উদ্বেল নিয়ত,
অবিশ্রাম করে তাড়া আগে-পিছে হাঙর-কুমির ;
গায়ে লাগে জেলিমাছ, জ্বালা করে, করে যায় ক্ষত,
ভাসি আর দিই ডুব—পণ্ডশ্রমে থাকি যে অস্থির।
তীরে উঠি সেখানেও আমাদের নহেকো বিশ্রাম,
তপ্তবালি মরুভূমি ধুধু করে দিগন্ত জুড়িয়া—
পাগলের মত ছুটি, সারা অঙ্গে ছুটে কালঘাম,
মৃত্যুদূত শকুনেরা ডাক দেয় উড়িয়া-উড়িয়া।
পাশাপাশি কেহ নাই, দূরে-দূরে ভাসিতেছি সবে,
জুটেছি কাঙাল যেন ধরণীর উচ্ছিষ্ট-উৎসবে।

* * *

ক্ষুধার্ত কাঙাল চক্ষে গতরাত্রে লেগেছিল ঘোর,
মত্ততা আসিয়াছিল নেশাছুট জীবনে মোদের—
গরিবের কুঁড়েঘরে চুপিচুপি এসেছিল চোর,
খোয়া গিয়েছিল কিছু গৃহস্থালী-সমাজবোধের।
বাদশাহি মসনদে বসেছিনু আবুহোসেনেরা,
কাব্য-পরী-হুরীদল করেছিল নৃত্য চারিপাশে—
স্বল্পমূল্য আসবের দুই পাত্র অমৃতের সেরা,
নন্দনের ইন্দ্রসভা রচেছিনু মনের আকাশে।
ধরণীর ধূলিযজ্ঞে আবির্ভূতা কবিতা-পাঞ্চালী
পঞ্চপাণ্ডবের কণ্ঠে দিয়েছিল বরমাল্যখানি,
এক রাত্রে জীবনের পানপাত্রে স্বপ্নসুরা ঢালি
বারংবার করি পান, উল্লাসেতে ফেলে দিই টানি।
ক্ষুধার্ত কাঙাল মোরা মেতেছিনু বাহুল্য-উৎসবে,
করি নাই কোলাহল, কাব্য-স্বপ্নে মত্ত ছিনু সবে।

* * *

দরিদ্রেরে রাজ্যখণ্ড তুমি দান করিয়াছ কবি,
সংসারের কোলাহলে ভুলে যাই, করি না স্বীকার-

ক্ষণে-ক্ষণে ঊর্ধ্বে উঠি, অকস্মাৎ সে স্বরাজ্য লভি
চকিতে বিস্ময় মানি লভিয়া বিপুল অধিকার।
কেবা রাজা ভুলে যাই, প্রজাদলে কে করে পীড়ন,
শাসন-শৃঙ্খল-ভার মন-বহ্নি করে ভস্মসাৎ
রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে বাধে ঘোর রণ,
মানুষের অধিকারে মানুষেই হানে যে আঘাত।
আমাদের রাজ্যখণ্ডে সে অশান্তি করে না প্রবেশ,
হে সম্রাট, গতরাত্রে পশিলাম সাম্রাজ্যে তোমার—
ভুলে গেনু ঊর্ধ্ব-অধঃ ভুলে গেনু স্থান-কাল-দেশ,
কোথায় পাতালগর্ভে ডুবে শব্দ মারণ-বোমার।
কাব্যমদে মত্ত মোরা এক সন্ধ্যা নিশ্চিন্তে ছিলাম,
সবাই স্বাধীন—শুধু ভালোবেসে লই তব নাম।

* * *

মানুষের স্বার্থ, তার বহু ঊর্ধ্বে মানুষের প্রেম,
কাব্যের আকাশে শুধু সেই প্রেম নিত্য জেগে রয়—
কল্পনা-পাখায় উড়ি মোরা সেথা ভাসিয়াছিলেম,
পিছনে পড়িয়া ছিল ধরণীর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভয়।
দেখিলাম শূন্যে-শূন্যে লক্ষ-লক্ষ আত্মীয় আত্মার
অবাধে ভ্রমিয়া ফেবে কহে কানে আশ্বাসের বাণী,
বহুশত যুগান্তের মানবের প্রেম-সমাচার,
বিচিত্র ভাষায়-ছন্দে শোনাইল কণ্ঠে-কণ্ঠে আনি।
এ যুগের প্রেম-কথা আমরাও শোনানু তাদের,
কহিলাম, আমাদেব চিত্তে তবু জাগে যে সংশয়—
ধুলার ধরণী হতে আর্তস্বর যে প্রতিবাদের
আজো ভেসে আসে শূন্যে মানুষের বাণী তাহা নয়।
সংশয়-তিমির-ছেঁড়া রৌদ্রালোকে অনির্বাণ-হাসি,
শুনিলাম কণ্ঠে-কণ্ঠে এক বাণী—"তবু ভালোবাসি।"

* * *

ভালোবাসি, ভালোবাসি—ধরাবাসী মোরা ভীরু প্রাণী,
একান্তে নিকটে পেয়ে ভয়ে মরি কখন হারাই—
প্রেমের বিজয়-ধ্বনি নহে তাই আমাদের বাণী,
বুকে টানি ভালোবেসে ঘৃণাভরে তখনি তাড়াই।
মানুষের ভালোবাসা আজো ধরে হিংসা-হত্যারূপ,
প্রেমের প্রকাশ আজো অবিশ্রাম শোণিত-বন্যায়,

সাগর-বেলায় মোরা খনিতেছি সংশয়ের কূপ—
অতল শান্তির বুকে জাগে-ভাঙে বুদ্বুদ-অন্যায়।
এত বাধা ভেদ করি মানুষের প্রেমের প্রয়াস,
তাই এত সুদুর্লভ আমাদের ভালোবাসাবাসি—
সে প্রেমে সুলভ করে ক্ষণিকের কাব্যের বিলাস,
মত্ততা-তরঙ্গে কাল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব গিয়েছিল ভাসি।
ধরার ক্ষুদ্রতা ছাড়ি গতরাত্রে উঠিয়াছিলাম,
দেখিনু আকাশ-ভালে ধরার মহৎ পরিণাম।

২ আশ্বিন, ১৩৪৯

মানস-সরোবর

সব ভুল, সব ভুল, যাহা কিছু জানিয়াছিলাম ,
সকল দিনের শেষে নাহি নামে রাত্রির আঁধার,
সকল রাত্রির শেষে জাগে না প্রভাত।
দিবসের উদয়াস্ত মানুষের মনের আকাশে,
কালের প্রবাহ চলে ধমনীর শোণিত-প্রবাহে।
লোল চর্ম পক্ক কেশ—এই মহাকালের স্বরূপ—
স্তব্ধ জড় অন্ধকার, হিমে-জমা তমসার স্রোত
গতিহীন তাই শব্দহীন।
নিশ্চল তুষার-স্তূপে বিন্দু-বিন্দু বুদ্বুদের মত
লক্ষ-লক্ষ যুগান্তের কোটি-কোটি মানুষের প্রাণ
চিরদিন আছে বন্দী হয়ে।
রৌদ্রকরস্পর্শে কভু গলিবে না সে হিম-তুষাব,
বন্দী প্রাণ মুক্ত নাহি হবে ;
অনন্ত তিমির-গর্ভে মানুষের অনন্ত বিশ্রাম।
এই মৃত্যু, এই পরিণাম।
সব ভুল, সব ভুল, যাহা কিছু জানিয়াছিলাম।

ক্লান্ত পক্ষ বিস্তারিয়া, রাজহংস পঁহুছিল শেষে
হিমাচল-পাদমূলে গাঢ়নীল মানসের তীরে।
হিমাচল—ধরণীর চিরন্তন অন্ধ সংস্কার,
যুগান্তের জড়ত্ব বিপুল।
তারই মাঝখানে রচা মানুষের কল্পনার চরম আশ্রয়
সুখস্বর্গ মানস-সাগর।
মনের অপূর্ব সৃষ্টি তাই তো মানস-সরোবর।
ভগ্ন পক্ষ রাজহংস পঁহুছিল মানসের তীরে।

মানস-সাগর—
সেখানে নীলের মাঝে জীবনের পরম ইঙ্গিত।

অসংখ্য উপলখণ্ড তীরে-তীরে যায় গড়াগড়ি,
পায়ে-পায়ে মৃতকল্প জীবনের উঠিছে ঝঙ্কার।
ধরণীর রাজহংসে নভচারী হংস-বলাকায়
আসিছে মানস-তীর্থে অবিশ্রাম ডানা ঝাপটিয়া,
দীর্ঘ পথ পার হয়ে হেথা তার সুদীর্ঘ বিশ্রাম।

আমারো বিশ্রাম জানি এই নীল মানসের তীরে,
যে মানস আমারই মানসে ;
মোর হিমাচল-মূলে স্তব্ধ-শান্ত নীলাম্বু-সায়র—
আমি রচিয়াছি সেথা ক্লান্তপক্ষ বিহঙ্গের অন্তিম বিশ্রাম,
আপনি করেছি সৃষ্টি টলমল নীল নীর স্বচ্ছ-সুশীতল,
অগাধ অতল জল, মোর তপ্ত জীবনের জ্বালা-অবসান।
পাখি এল কুলায়ে আপন,
নামিছে অনন্ত রাত্রি আলো-ঝলা ছাইয়া আকাশ,
নামিছে অনন্ত অন্ধকার।
দেখিতে পাই না চোখে ভগ্ন-জীর্ণ আপনার পাখা,
শুনিতে না পাই কানে দিবারৌদ্র-ক্ষুধাতুর শাবকের ব্যাকুল
কাকলি।
বহুদূর নদীতীরে সায়াহ্নের শঙ্খঘণ্টা বাজিতেছে বিদীর্ণ মন্দিরে,
দেবতার শেষ পূজা হল সমাপন—
বাতাসে তরল হয়ে তারই রেশ পশিতেছে কানে।
প্রান্তরে প্রাঙ্গণে হোথা তুলসীর বেদিমূলে সন্ধ্যাদীপ হইয়াছে
জ্বালা,
মানসের অন্ধকারে তারি দীপ্তি সারি-সারি জ্বলিতেছে খদ্যোত-
শোভায়।

রাজহংস, করিও না ভয়।
অদূরে কৈলাস-চূড়ে পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদ হানিতেছে ব্যথিত চুম্বন।
তোমার সকল আশা, যুগান্ত কামনা তব শোভিতেছে বিশীর্ণ
সুন্দর,
তুষার-স্ফটিক-দীপ্তি হাসিতেছে অন্ধকারে মৃত্যু-ম্লান হাসি।
রাজহংস, করিও না ভয়—
দীর্ঘ পথ হল শেষ, হের কাঁপিতেছে ওই—
কাঁপিতেছে মনোহর নীল-অম্বু মানস-সাগর।

কার্তিক, ১৩৪৮

আমি

প্রতিদিন আকাশের চেয়েছি বারতা,
মাটির আঁধার হতে বিষ-বাষ্প দিয়াছে উত্তর।
মোর শান্ত মুহূর্তের অন্তরের সহজ কামনা—
উদার পরিধি আর অনন্ত বিস্তার,
আলোকের প্রসার বিপুল—
উত্তেজিত মুহূর্তের মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র চক্রব্যূহে,
কুণ্ডলিত সর্পসম পাকে-পাকে জড়ায়ে-জড়ায়ে
ফুঁসিয়াছে জীর্ণ-ক্ষুদ্র আপন বিবরে ;
বৃহতে করেছে ক্ষুদ্র, সীমাহীনে দিয়াছে সীমানা,
অভ্রচুম্বী চূড়া মোর নিমেষে করেছে ধূলিসাৎ।
কে আমি, কি মোর পরিচয়—
এই চিরন্তন দ্বন্দ্বে বারম্বার পাসরি-পাসরি
ভালোমন্দে গড়া আমি মোর বিশ্বে পেয়েছি প্রকাশ।
কেহ করিয়াছে ঘৃণা, কেহ মোরে বাসিয়াছে ভালো,
কেহ আসিয়াছে কাছে, দূরে কেহ করে পরিহার—
তাহাদের ঘৃণা আর ভালোবাসা, রূপ, রস, রঙ
আমারে করেছে সৃষ্টি, সেই আমি সংসারের জীব ;
সত্য পরিচয় মোর গোপন রহিয়া গেল, হবে না প্রকাশ
কোনদিন।

জীবনের দুঃখ শোক-লাঞ্ছনা ও অপমান-মাঝে
এই শিক্ষা আমি লভিয়াছি—
মহতেরে-বৃহতেরে প্রতিদিন করিব স্বীকার।
দ্বিধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে, ভুল-ভ্রান্তি স্খলন-পতন—
আছে লোভ বীভৎস, কুৎসিত,
আছে ক্ষুধা, আছে ক্ষোভ, বেদনার ঝরে অশ্রুজল।
সমস্ত ক্ষুদ্রতা-ক্ষোভ অসহ্য যন্ত্রণা-দুঃখ-মাঝে,
প্রতিদিবসের অতি ব্যর্থ-শূন্য-নিরর্থক কাজে—
মাথার উপর স্থির স্তব্ধ-শূন্য-অনন্ত আকাশ,
দীর্ঘ বনস্পতি-শিরে নবশ্যাম কচি কিশলয়,
নামহীন পাখিদের গান,
নিভৃত অন্তর-মাঝে ক্ষণে-ক্ষণে গেয়ে-ওঠা বঞ্চিতের
অসম্পূর্ণ গান,
হঠাৎ কাঁপিয়া-জাগা সুর,
হঠাৎ ভাঙিয়া-পড়া বন্ধুত্বের প্রণয়ের উচ্ছ্বাস প্রচুর।

নিজে বেশ ভালো আছি, অকস্মাৎ বুঝিয়া বিস্ময়ে
নিপীড়িত দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাসে দুই চক্ষে ছলছল জল—
যতই ক্ষুদ্রতা থাক, যত আমি ব্যর্থ হই, বৃহতে-বিরাটে
নমস্কার,

নমঃ শূন্য নীলাকাশ,
নমো-নমো-নমঃ হিমালয়,
মানুষের ভগবানে প্রণমিয়া মানুষেরে করি নমস্কার।

ঊর্ধ্বে শূন্য নীলাকাশ,
বারম্বার তবু ভুল হয়—
ঘরের কপাট রুধি, বাহিরের রুধিয়া বাতাস,
আপনার বিষ-বাষ্পে আচম্বিতে হাঁপাইয়া উঠি ;
মর্মভেদী নিঃস্বতায় আত্মীয়েরে করি উৎপীড়ন,
রূঢ় কহি প্রিয় বন্ধুজনে—
বিকৃত-বীভৎস রূপে আপনার স্বরূপ প্রকাশ—
আপনি শিহরি উঠি নিজেরে প্রত্যক্ষ করি মনের মুকুরে।

কারে কহি, কারে বা বুঝাই,
মোর মূর্তি সত্য এ তো নহে—
সে তো নহি আমি।
পীড়িতের-ব্যথিতের যন্ত্রণায় মধ্যরাত্রে একা জাগি আমি,
একা গাহি গান—
কেহ মোরে দেখিল না, বুঝিল না গান কি যে বলে—
অর্থ তার গুপ্ত রহে সুর আর ছন্দের আঁধারে,
আমি—মোর নামের আড়ালে ;
নাম সে মরিয়া যাবে, উদার-নিঃসীম শূন্যে আমি তবু
রহিব জাগিয়া।

বন্ধু, শোন তোমাদেরে বলি
অনন্ত আমার এই চোখে-দেখা খণ্ড ইতিহাস,
যতটুকু আমি তার জানি—
আকাশে খসিছে তারা, নদীতটে ভেঙে পড়ে ঢেউ,
ছায়া কভু পড়েনাকো শুভ্র-স্বচ্ছ আকাশের নীলে,
দাগ কভু পড়ে নাই টলমল বারিধির বুকে ;
সে বিরাট শূন্যতায় আমি পরিচয়-হীন তোমাদের কাছে ;
তোমরাও নহ প্রয়োজন।
সেখানে একাকী আমি, সে অসীম একান্ত আমার—
ভাষাহীন সে অসীমে চিরমূক ইতিহাস মোর।

শূন্যতায় রৌদ্র করে মায়ার সৃজন,
রূপে-রঙে তাহার বিকাশ—
মানুষেরে রঙ দেয় রূপ দেয় শুধু ভালোবাসা,
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে একমাত্র মায়া-জাদুকর।
আমি ভালোবাসার কাঙাল—
আমারে ডাকিয়া কাছে আমারে নির্মাণ করি লও
ক্ষণিকের আলোক-সম্পাতে,
তোমাদেব প্রেমের আলোকে।
দেহহীন মানুষেরা নিরালম্ব ভাসিছে অসীমে
পরস্পর পরিচয়হীন—
যার যত ভালোবাসা তার কাছে ততোই প্রকাশ।
বিশ্ব তার ভরে ওঠে রূপের গৌরবে,
প্রেমের রহস্যে ঘেরা এ-বিশ্বের পরিধি বিপুল—
আমারে তোমরা দাও প্রেম,
রূপ দাও, দেহ দাও মোরে।

সমস্ত বেদনা-বিষ এ জীবনে করিয়া মন্থন
মুঠি ভরি যে অমৃত এতদিনে করিয়াছি পান,
সাধ যায় জনে-জনে নিজ হাতে দিতে সেই সুধা—
নিজেরে প্রকাশ করি সকলেরে গড়িয়া তুলিতে ;
মুছে-যাওয়া শূন্যতায় রূপহীন মানুষের আর কোনো
নাহি পরিচয়।

পৌষ, ১৩৪৩

নচিকেতা

নচিকেতা, তব সন্ধান হল শেষ?
মৃত্যু-আলয়ে আতিথ্য লভি ফিরিলে মর্ত্যভূমে ;
প্রশ্নে-প্রশ্নে যমে জর্জর করি
মনোমত বর লভিয়া হে ঋষি, তমসা হইয়া পার
আসিলে ফিরিয়া সাধের এ-মরলোকে।
মিলেছে কি সমাচার?
কঠোর কঠোপনিষদে তোমার কাহিনী কি কহে কথা,
মৃত্যু-লোকের খবর কি আছে তায়?
হায় নচিকেতা, বিফল যাত্রা তব।

নচিকেতা, তব সাধনা কঠোর কি দিল আমারে আনি?
একটি কাহিনী—উপলখণ্ড কালবারিধির তটে,
যজ্ঞ-অগ্নি তাহারই একটি নাম।
হয় নচিকেতা, মর্ত্যলোকের জীবন মরণশীল,
ধরার বিরহ-ব্যথায় কাতর-শঙ্কিত-ভীরু প্রাণ
তোমার কাহিনী মাঝারে তাহারা পেয়েছে কি আশ্বাস,
সম্মুখ হতে উঠেছে কি কারো প্রাণমৃত্যুর রহস্য-যবনিকা,
দৃষ্টি হইতে ছিঁড়িয়া খসেছে কারো সংশয়-জাল?
হায় নচিকেতা, বিফল সাধনা তব।

নচিকেতা, মোরা যুগ-যুগান্ত বসিয়া রয়েছি
নীল বারিধির কূলে,
পাই না দেখিতে কি আছে সলিল-তলে।
শুধু গর্জন শুনিতেছি কানে অনন্ত কাল ধরি,
দেখিতেছি চোখে ফেনাময় চপলতা।
বালুতটে শুধু তরঙ্গলীলা আছাড়ি-আছাড়ি পড়ে—
আছাড়িয়া পড়ে, রাখে না চিহ্ন কোনো ;
তটে তরঙ্গে এই পরিচয় শত কোটি বর্ষের—
তট তরঙ্গ তবু পরিচয়হীন।

নচিকেতা, মোরা বালুতটে বসি রয়েছি চাহিয়া
সলিল-সমাধি-তলে,
রয়েছি চাহিয়া যুগ-যুগান্ত ধরি—
মণি-বিখচিত প্রবাল-ভূষণ তুমি একবার
এনেছিলে ডুব দিয়ে,
তাহারই কাহিনী শুনিতেছি প্রতিদিন,
শুনি রূপকথা নচিকেতা-মৃত্যুর।
শুনি আর দেখি, একটি-একটি করে
তটের বালুকা খসিয়া-খসিয়া পড়ে,
কাল-তরঙ্গে একে-একে সবে ডুবিছে মর্ত্যপ্রাণী।
পিছনে যাহারা প্রতীক্ষা করে বালুতট-আশ্রয়ে,
তারা দেখে বিস্ময়ে—
যারা যায় তারা ফিরিয়া আজিও আসিল না হায় কেউ,
ডুবলি যাহারা উঠিল না তারা কেউ।
নচিকেতা, তব প্রাচীন কাহিনী মানি যে অর্থহীন,
মৃত্যুর কালো, আলো তার মাঝে পশিবে না
কোনোদিনও,
নচিকেতা, ছাড়ো পুরাতন প্রতারণা।

আশ্বিন, ১৩৪৮

এই যুগ

এ যুগের কথা কহিবে সে কোন্ কবি,
এ যুগের কথা কয়জন বল জানে?
বিদেশি কেতাবি বুক্‌নি প্রয়োগে অতীব 'ক্রেভাব' যারা,
তাহারা কহিতে চাহিছে যুগের ভাষা।
কাগজের 'বেড়ে' ফোটে কাগজের ফুল—
কাগজের ফুলে রঙ শুধু আছে, নাহিকো মাটির ভাষা—
রঙ সে নামিয়া আসে না আকাশ হতে,
ড্রয়িং-রুমের ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত সেই রঙ যে চমৎকার!
যুগমানবের ঠেকিতেছে ঘোর-ঘোর,
যাহা নয় তারা তাহাই সাজিয়া বসিছে রঙের মোহে।

এ যুগের গান গাহিবে সে কোন্ কবি?
যুগ সে নূতন, নূতন মানব, প্রাণ সে চিরন্তন ;
ধ্বনিয়া তুলিবে নব-মানবের পুরাতন সেই প্রাণে
লক্ষ যুগের শত অলক্ষ্য সুর,
এ যুগের গান গাহিতে কে বল জানে?
লাঞ্ছিত হয় সুর প্রতিদিন সুরের বিকৃতি-মাঝে,
কান্না ফুটিয়া উঠিতেছে তাই অট্টহাসির রোলে,
কান্নার মাঝে শুনি খলখল হাসি।

এ যুগের ভাষা আজো কেহ বলিল না—
অনাদি-অসীম ভাষার বারিধি, কল্লোল তার কানে নাহি
যায় শোনা।
এ যুগের ভাষা তটে-লেগে-ভাঙা ঢেউয়ের মাথায়
ফেন-বুদ্বুদ যেন,
নিমেষে জাগিয়া নিমেষে মিলায়ে যায় ;
কাল-বারিধির খরবালুতটে এ যুগভাষার রবে না চিহ্ন
কোনো,
এ যুগের কবি আজিও ভাষায় লেখেনি মনের কথা।

যুগগৌরবে গর্বিত যারা, যুগের কবির খ্যাতিলোভ
যাহাদের,
তাহারা কহিছে যুগের নকল ভাষা—
শুধু মনগড়া অভিনব ভঙ্গিতে,
দম্ভের ভঙ্গিতে।

বনের আঁধারে অগভীর ডোবা, সলিলে তাহার নাহি
অতলের ভাষা,
পচা পাতা আর পঙ্কবাষ্পে জাগাইছে তারা অবিরাম
কোলাহল ;
নগরীর পথে জাগিয়া যেমন আছে চিরদিন হতভাগা
উন্মাদ,
উলঙ্গতার উল্লাস লয়ে দৃষ্টি সবার করিতেছে অধিকার।
তেমনি যুগের নকল কবিবা সবে
শ্রেষ্ঠ এবং বৃহতে নিত্য করিতেছে উপহাস ;
ফুলেরে বলিছে প্রাচীন মনেব ভুল,
হিমালয় হতে বড় বলি মানে ক্ষণিকের কুয়াশায়।
বুক যা বলুক, মুখে বলিতেছে শুধু বিপরীত বুলি,
বিকৃত রুচির বীভৎস চিৎকার!

এ যুগেব বাণী নয় তাহাদের।
মিথ্যার মোহে তারা যা জেনেছে যুগের সত্য কভু তাহা
নয়-নয়।
বিকৃত ক্ষুধার আধুনিক ফাঁদে কভু কাঁদে নাই পুরাতন
ভগবান,
মানুষের রূপ কভু শুধু নয় কাম-কামনার রূপ।

এ যুগের কথা কবে কে যুগন্ধর—
যুগের ধর্ম কোন্ তপস্বী জানে?
হুজুগ যে যুগে প্রবল প্রতাপে ধর্মের নামে খেলিছে
চরম খেলা,
তুলেছে কি কেউ যুগমঞ্চের রহস্য-যবনিকা?
হৃদয় মেলিয়া দেখেছে কি কেউ পিছনে তাহার চলিছে যে
অভিনয়—
আশা-আকাঙ্ক্ষা হাসি ও অশ্রু আনন্দ-বেদনার!
প্রাচুর্য-মাঝে ক্ষুধিত ভোগের বিলাসক্লিষ্ট রূপ,
পীড়িত-ব্যথিত অন্নহীনের অসহায় হাহাকার,
শিশুর কাকলি, জরার মরণশ্বাস,
জীবনমৃত্যু ফেলিছে চরণ পাশাপাশি গলাগলি।
সবারে ছাড়ায়ে নর-মানবের গগনস্পর্শী বিপুল জয়ধ্বনি .
শুনিয়া শিহরি সভয়ে সে কোন্ কবি
মরিয়া-অমর যুগ-মানবের রচিয়াছে বন্দনা?

মহাযুদ্ধের শেল-শক আর মারণ-বাষ্পে জন্ম লভিল যারা,
ধরার-মাটির-প্রথম-পরশ-কান্না যাদের ডুবেছে মেশিন-গানে,
এবং যাহারা ঘুমাইয়া ছিল সভাপর্বের বিলাস-ব্যসন মাঝে,
সে ঘুম যাদের ট্রেঞ্চ-শয্যায় তিমিররাত্রে ভেঙেছে
আচম্বিতে,
এবং যাহারা গৃহে অনশনে প্রতিদিন পেল প্রিয়বিয়োগের
ব্যথা,
ছিন্নহস্ত ভগ্নচরণ জাগিল যাহারা হস্‌পিটালের 'বেডে',
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে শিরায়-শিরায় আজো বহে যারা মৃত্যুর
যন্ত্রণা,—
উত্তেজনায় উন্মাদ হল যারা,
মৃত্যু যাদের কাঁধে হাত দিয়া বলিয়া গিয়াছে, হে বন্ধু,
আমি আছি,
মৃত্যুর ভয়ে জীবনে লইয়া ছিনিমিনি-খেলা যারা খেলে
সুতরাং—
আমবা তাহারা নহি—সেই কথা এ যুগের কবি স্মরণে
কি রাখিয়াছে!
মোদেরে পিষিয়া চাহে না মারিতে ওদের ঘরের শত
সমস্যাভারে।

আমরা তাহারা নহি।
তাহাদের ঢেউ আকাশ-সাগর ডিঙায়ে যদিও লেগেছে
মোদের গায়ে—
ড্রইং-রুমের টেবিলে মোদের চা-র পেয়ালায় তরঙ্গ
তুলিয়াছে ;
চুমুকে-চুমুকে কথায়-কথায় মোরা কয়জন সে ঢেউ
করেছি পান,
মোদের উদরে সে ঢেউ পেয়েছে লয় ;
পারেনি নড়াতে অনড় মোদের জগন্নাথের রথে—
বিপুল-বিরাট ঘুমন্ত রথ চলে নাই একতিল।

আমাদের যুগ আজো যে মধ্যযুগ—
সিনেমা-রেডিও-টেলিভিশনের 'কোটিং' যদিও পড়েছে
তাহার গায়ে ;
'কোটিং' উঠিতে লাগে-বা কতক্ষণ!
পোড়া-মাটি আর বালু-পাথরের জড়-রূপটাই মোদের
সত্য রূপ।

অনড় মাটির কে গাহিবে জয়গান।
মোদের মুক্তি? আধখানা তার পীরদরগার এখনো
সিন্নি-মাঝে,
পাদোদক আর তাবিজ-মাদুলি, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে ;
বাকি আধখানা গ্যানোর ফিজিক্স, চরকসংহিতায়।
বিজ্ঞান আর দৈবে মিলিয়া প্রায় মাঝামাঝি বিংশ
শতাব্দীতে
ঘরে ও বাহিরে অদ্ভুত খেলা খেলিছে বঙ্গদেশে—
এ যুগে মোদের প্রত্যেক ঘরে অহরহ চলে সেই দড়ি
টানাটানি—
কভু বিজ্ঞান কভু দৈবের জয়।
অতি-বিচিত্র কোলাকুলি কভু আদিমে ও আধুনিকে—
জ্ঞানে-সংস্কারে মধুর সমন্বয়।

কোথা সে চারণ, এই দ্বন্দ্বের যে গাহিবে ইতিহাস,
গাহিবে এবং ভাসিবে চোখের জলে?

অতি-পুরাতন ঘুম-জড়া চোখে লেগেছে কখন খর
টর্চের আলো,
বিস্ময়ে-ভয়ে শয্যায় জেগে ভাবিতেছি কাজে বাহির
হইতে হবে।
জড়তা রয়েছে জড়ায়ে অঙ্গখানি,—
কর্মবাতুল বংশী অদূরে আকাশ চিরিয়া ডাকিছে মুহুর্মুহু,
পঞ্জিকা-পুথি খসিয়া পড়েছে কম্পিত হাত হতে ;
হঠাৎ চাবুকে রূঢ় পদাঘাতে স্মরণ হতেছে, কারাগারে
আছি শুয়ে,
ডাকিছে প্রহরী, ভোর হল জাগো-জাগো ;
ঘানির গর্ভে সরিষা কাঁদিছে, আমারে মুক্তি দাও,
পারি না বহিতে এ দেহে তৈলভার ;
এ আধ-আঁধারে জাগিয়া চকিতে প্রায়নিরন্ধ্র
কারাকক্ষের মাঝে
অনভ্যাসের প্রথম আবেগে কঠিন দেয়ালে কপাল
গিয়াছে ঠুকে ;
সেই ব্যাকুলতা এ যুগের কবি বুঝিতে পারিয়া লিখেছে
সাহস করি,
বলেছে, বন্দী, এই তো মুক্তিপথ?

আমরা সহজ নহি—
স্কন্ধে অতীত ভর করিয়াছে, ভূতের প্রকোপে জটিল
মোদের মন ;
ভবিষ্যতের রোজারা আসিয়া নির্মম করে করিতেছে
কশাঘাত,
বর্তমানের হতাশাপঙ্কে আমরা পড়িয়া শুধু খাইতেছি মার,
অতীত কখনো প্রবল, কভু-বা প্রবল ভবিষ্যৎ—
দুয়ের দ্বন্দ্বে মোদের বর্তমান।
সহজ মনের অনুভূতি দিয়ে বর্তমানেরে দেখেছে সে
কোন্ কবি
আপন চোখের সহজ দৃষ্টি দিয়ে—
পাউন্ড-লরেন্স-হাক্সলির চোখে নয়!

এ-যুগের কথা কহিবে কোথায় সে কবি উদার-প্রাণ,
ফুল হিমালয় আকাশ-বাতাসে নিন্দা না করি
নূতনত্বের মোহে—
পতনোত্থানে, প্রেমে ও দ্বন্দ্বে গাবে মানুষের জয়—
বন্দী মানুষ, ব্যর্থ মানুষ, পীড়িত মানুষ—তবু
মানুষের জয়।

চৈত্র, ১৩৪৪

বঙ্কিমচন্দ্র

ঘোর দুর্গম অতি-বিস্তার গভীর অরণ্যানী—
গর্বিত শিরে দাঁড়াইয়া আছে হাজার বনস্পতি ;
শাল্মলী-শাল-শিশু-তিন্তিড়ী-আম্র-পনস-দেবদারু সারে-সার।
পাতায়-পাতায় মেশামেশি হয়ে চলে অনন্ত শ্রেণী,
বিচ্ছেদহীন ছিদ্রবিহীন রবিরশ্মির নাহি অবকাশ-পথ ;
বায়ুতরঙ্গে তরঙ্গায়িত শতক্রোশ-ব্যাপী বারিধি পল্লবের—
এপারে উঠিয়া ওপারে ভাঙিছে সুদূরপ্রসারী সবুজ পাতার ঢেউ,
অতল নিম্নে গহন অন্ধকার।
অমাবস্যার তিমির রাত্রি সূর্যদীপ্ত প্রখর দ্বিপ্রহরে,
অস্ফুট আলো আঁধার ভয়ঙ্কর।
বৃক্ষপত্র-মর্মর ; আর নিম্নে শ্বাপদ, কুলায়ে-কুলায়ে পাখি—
থাকিয়া-থাকিয়া আর্তকণ্ঠে উঠিছে তাদের বিলাপ-কাতর ধ্বনি ;
যেতেছে মিলায়ে তরঙ্গহীন নৈঃশব্দ্যের মাঝে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর।
তরল তিমির অরণ্যশাখে নিবিড় হয়েছে যেন,
জটিল হইয়া কাণ্ডে-কাণ্ডে বেঁধেছে গ্রন্থি শত—
পায়ের তলায় সাপের মতন জড়াইয়া পাকে-পাকে
রচিতেছে যেন কুটিল-জটিল-পিচ্ছিল শত বাধা।
স্তব্ধ এখন গভীর অরণ্যানী।
লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি পশু-কীট-পতঙ্গ-বিহঙ্গ অগণন
আতঙ্কে যেন নিশ্বাস রুধি আছে।
অন্ধকার সে তবু হয় অনুভব,
অননুভব এ নিস্তব্ধতা শব্দিত পৃথিবীর।

বিদারণ করি নিশীথ-তিমির
বিদারণ করি স্তব্ধতা ভয়াবহ
ব্যাকুল কণ্ঠে কে শুধায়, "প্রভু, হবে কি সিদ্ধ আমার মনস্কাম?"
নিবিড় তিমির কাঁপিয়া-কাঁপিয়া যায়।

পড়িতে-পড়িতে অজ্ঞাতসারে সে বনগহনে হারায়ে গেলাম পথ,
শুনিনু কে যেন কাতরকণ্ঠে কাহারে শুধায় তিমির মথিত করি,
"হবে কি সিদ্ধ, হে প্রভু আমার, হবে কি সিদ্ধ একটি মনস্কাম?"

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী—
প্রান্তরপথে চলিতেছিলাম প্রিয়সম্ভাষী ভবানন্দের সাথে,
মল্লার রাগে প্লাবিয়া আকাশ গাহিতেছিলেন গুরুগম্ভীরনাদে—
জন্মভূমির বন্দনা-গীতি সে 'বন্দে মাতরম্।'
নয়নে অশ্রু উথলি উঠিল মোর,
লক্ষ স্বর্গ হতে গরীয়সী মহীয়সী মা আমার!

রজনী প্রভাত, বিজন কাননভূমি—
পক্ষীকূজনস্পন্দিত সেই নন্দিত বনভূমি,
'আনন্দমঠে' সত্যানন্দ বসিয়া যেথায় অজিন আসন 'পরি।
পরম আদরে দেখালেন মোরে মা-র মন্দিরে সুড়ঙ্গপথে ঢুকে,
মা যাহা ছিলেন, মা যাহা আছেন, যাহা হইবেন জগদ্ধাত্রী মাতা।
সভয়ে চকিতে মায়েরে প্রণাম করি
আর্তকণ্ঠে গাহিতে-গাহিতে তাঁর বন্দনা-গান,
'আনন্দমঠে' 'সন্তান'দলে লিখিয়া আপন নাম
ব্রহ্মচারীর চরণে বসিয়া দীক্ষিত হইলাম।

মা-র সন্তান ফিরিতেছি পথে-পথে—
মন্বন্তরে দুর্ভিক্ষের উঠিয়াছে হাহাকার,
মন্বন্তরে জাগিয়াছে মারীভয়।

শব আছে, শুধু জ্বলেনাকো চিতা, অধূম শ্মশানভূমি ;
রাজার শাসন তারি মাঝখানে ফিরিছে পীড়ন-রূপে,
শোষক ফিরিছে শাসক-ছদ্মবেশে।
সহসা শূন্য ব্যেপে
গুড়ুম-গুড়ুম ধ্বনিল কামান সম্মুখে আশেপাশে,
বিশাল কানন কম্পিত করি ধ্বনিল মুহুর্মুহু—
দূর নদীপথে ভেসে গেল তার ভীষণ প্রতিধ্বনি।
জননী-সেবার সন্তান মোরা চমকি জাগিনু মৃত্যু-আহব-মাঝে ;
ভগ্ন হস্ত, কর্তিত পদ, মুখে অবিরাম সে 'বন্দে মাতরম্'।
মৃত্যুর মাঝে রাজায়-প্রজায় শেষ হল বোঝা-পড়া।
অর্জন কেহ করিনু পুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মরিনু কেহ—
মন্বন্তরে নূতন অভ্যুদয়।
সন্তান-নেতা সত্যানন্দ, কে মহাপুরুষ ধরিলেন তাঁর হাত,
লইয়া তাঁহারে গেলেন সুদূর নিরুদ্দেশের পথে—
প্রতিষ্ঠা গেল, আসিল বিসর্জন।

* * *

ত্রিস্রোতা নদী তারি তীরে-তীরে অরণ্য সুগভীর,
গহনে তাহার সুড়ঙ্গপথে আঁধার ধরণীতলে
প্রস্তরে গড়া পুরাতন দেবালয়।
বনপথ ধরি একাকী চলিছে ভাঙা সেই দেবালয়ে
দস্যু-নেত্রী সে দেবী-চৌধুরানী,
ধরাগর্ভের মন্দিরে যেথা দীপ জ্বলে মিটিমিটি।
স্তিমিত আলোকে দেখি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের পূজা,
পূজারি দস্যু ভবানী পাঠক নিজে।
বাঙালি মেয়ের রূপ দেখিলাম দস্যু-নেতার চোখে,
সন্ন্যাসিনী সে ভগবতী তবু সাক্ষাৎ রাজরানী—
রূপেতে লক্ষ্মী, মঙ্গলময়ী বরাভয় দুই করে ;
অযাচিত দানে লোভী সন্তানে পালন করিছে মাতা।
যোগশাস্ত্র ও ভগবদ্গীতা গুরু ভবানীর কাছে
শিখিয়া সকল কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে সঁপিয়াছে।

হরবল্লভ রায়ের বাড়িতে খিড়কি-পুকুরঘাটে
ঘোমটায় মুখ ঈষৎ ঢাকিয়া যত্নে বাসন মাজিছে নূতন বধূ—
সাগর-বউয়ের সাথে-সাথে মোরা নূতন বউয়ের দেখিনু নূতন রূপ।
রুপার সিংহাসনে যে বসেছে হীরার মুকুট শিরে,
গীতার ধর্ম শিখিয়া যে জন নিষ্কাম রাজরানী,

দাসীর মতন করে সেই গৃহকাজ ;
নারীর ধর্ম রাজত্ব করা নয়—
কঠিনতর যে ধর্ম তাহার পালন ঘরের কাজ,
কোনো যোগ-চেয়ে সহজ নহে এ যোগ।
নিরক্ষরের স্বার্থপরের অনভিজ্ঞের দলে রহি প্রতিদিন
সরল সেবায় সকলেরে সুখী করা।
কেহ জানিল না জ্ঞানের বহ্নি জ্বলে অন্তর-মাঝে,
নিষ্কাম তবু সুকর্মপরায়ণা—
বাহিরে-ভিতরে আসল সন্ন্যাসিনী।
ভবানীঠাকুর হাতে গড়িয়াছে শাণিত কুঠার-সম
সহজে ছিন্ন করিতে সে পারে অতীব জটিল গ্রন্থি সংসারের।
কেহ জানিল না ছেদন করিল কি যে,
কেহ জানিল না আপন মর্মগ্রন্থি ছিঁড়িল কি না
সে দেবী-নিবাসে প্রবেশ করিনু পড়িতে-পড়িতে এ দেবী 'চৌধুরানী'-
শুনিলাম বাণী—নিরাশ জনের পরমাশ্বাস-বাণী,
'দুষ্কৃতে নাশ, সাধু-সুজনের পরিত্রাণের লাগি,
স্থাপিতে ধর্ম সংসারে তাঁর সম্ভব যুগে-যুগে।'

* * *

সপ্তমী পূজা—কমলাকান্ত বসেছে আফিম খেয়ে,
তার সাথে-সাথে আমি দেখিলাম চলিছে কালের স্রোত,
দিগন্ত ব্যেপে চলিছে প্রবলবেগে—
ভাসিয়া চলেছি তারি মাঝখানে ক্ষুদ্র ভেলায় চড়ি,
ভাসিয়া চলেছি অসীম অকূলে ভীষণ অন্ধকারে ;
বাত্যাক্ষুব্ধ তরঙ্গ নিচে, ঊর্ধ্বে তারকা জ্বলে—
কভু উজ্জ্বল, কভু ম্লান, কভু নিবিয়া-নিবিয়া যায়।
মনে হল, আমি একা নিতান্ত অভাগা মাতৃহীন
কালসমুদ্রে ভাসিয়া চলেছি সে মাতৃ-সন্ধানে—
কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি জননী বঙ্গভূমি।
চকিতে দেখিনু দূরে বহুদূরে প্রভাত-অরুণ-আভা,
স্নিগ্ধ মন্দ-পবন বহিল যেন।
বায়ু-তরঙ্গ-তাড়িত সলিলে স্বর্ণকান্তি প্রতিমা সপ্তমীর
হাসিছে-ভাসিছে-ছড়াইছে আলো, দিঙ্মণ্ডল আলোয় আলোকময়-
সভয়ে চিনিনু এই তো আমার জননী জন্মভূমি ;
রত্নাভরণ-ভূষিতা জননী মৃন্ময়ী মা আমার—
দশ ভুজ তাঁর প্রসারিত দশদিকে।

পদতলে তাঁর পীড়িত শত্রু—শত্রুবিমর্দিনী,
ডাহিনে ভাগ্যরূপিণী লক্ষ্মী, বামে বাণী বাগ্‌দেবী,
সমুখে বসিয়া ত্রিভুবনজয়ী কুমার কার্তিকেয়,
সিদ্ধিপ্রদাতা গণেশ অন্যপাশে।
সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা ভাসে কালস্রোতোজলে,
তাঁহার চরণে দিনু পুষ্পাঞ্জলি।
দেখিতে-দেখিতে কাল-সমুদ্রে ডুবিল প্রতিমাখানি—
মনের মানসে বিধি আজো মিলাল না।
মনুষ্যত্ব মেলেনি মোদের, ঐক্য-বিদ্যা-গৌরব ঈপ্সিত ;
সুখ-দুঃখের সীমা-রেখা পার, নষ্ট সুখের স্মৃতি,
চাহিবার শুধু পড়িয়া রয়েছে বিরাট শ্মশানভূমি।
কুলুকুলু নদী বহিছে গঙ্গা সে মহাশ্মশান বেড়ি,
একদা নিশীথে নীরবে জননী লজ্জায় মুখ ঢাকি
শঙ্কিত পায়ে নামিলেন জলে বাহিয়া সোপানাবলী,
নিবিড় তিমিরে নির্বাণমুখ আলোকবিন্দুবৎ।
ক্রমে-ক্রমে সেই মহা-তেজোময়ী বিলীন সলিল-তলে ;
কাঁদে সন্তান শ্মশান-শয়নে, তবু না উঠিল মাতা।
কবে উঠিবেন ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা তার করি।

* * *

সম্মুখে মোর প্রাচীর-গাত্রে ঝুলে আলেখ্যখানি—
আলেখ্য নয়, সুতীক্ষ্ণ অসি ঝলিছে নয়ন-আগে।
নিবিড় তিমির এ অসি-ফলকে খণ্ড-খণ্ড করি
হয়তো একদা ঘোর অরণ্যে মিলিবে চলার পথ।

চৈত্র, ১৩৪৩

মাইকেলবধ-কাব্য

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাইকেলের 'মেঘনাদবধে'র প্রথম কয়েকটি পংক্তিকে পুরাতন ও আধুনিক কয়েকটি ছন্দে রূপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করেন। তাঁহার নির্দেশমত আমরা চর্যাপদ হইতে শুরু করিয়া কালানুক্রমিক আধুনিক গদ্য-কবিতা পর্যন্ত প্রধান প্রধান কবিদের ভঙ্গি অনুকরণ করিয়া এই ছন্দ-প্রকরণ প্রস্তুত করিয়াছি।

মাইকেলের মূল (১৮৬১ খ্রিঃ)

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীরচূড়মণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি।
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ?

লুইপাদ প্রভৃতি : চর্যাপদ (আনুমানিক ৯৫০-১২০০ খ্রিঃ)

বিরবাহু বীরা	জখণ মঈলা।
রাবণ-মণ্ডল	সঅল[১] ভাগীলা॥
অমিঅ-বঅণি দেই[২]	পূছমো তোরেঁ।
পুণু দলবই[৩] করি	আহব ঘোরেঁ॥
(জমঘর জৈহণ[৪])	কাহক মেলীলা[৫]।
নিশাচর রাআ[৬]	রাবণ কোপীলা[৭]॥
এই সঅল কথা	বোল বাঅ-দেঈ[৮]।
জা রস গোড়জণ	পিউ[৯]—মহু[১০] কহেই॥

নির্বাচিত অংশ।

১ সকল। ২ দেবী। ৩ দলপতি, দলুই, সর্দার, সেনাপতি। ৪ যেন, যেমন। ৫ বিদায় দিল, পাঠাইল। ৬ রাজা। ৭ কোপযুক্ত। ৮ বাক্‌দেবী, সরস্বতী। ৯ পান করুক। ১০ মধু = মধুসূদন।

বড়ু চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (আনুমানিক ১৪০০ খ্রিঃ)
(স্বরান্ত করিয়া পড়িতে হইবে)

সমুখ সমর মাঝ বীরচূড়ামণী।
বীরবাহু বীর জবে পড়িল মেদনী॥
আমিআঁ-মিশাইল বোল বোল দেবী বাণী।
আন কোণ জন আনি সেনাপতি মাণী॥
রণ-স্থলে যেন রাজা রাঘবের ডরেঁ।
রাবণ পাঠাইল তাক সমণের ঘরেঁ॥
বড়ায়ি নাহিঁক এথাঁ, তোম্মাঁ পুছোঁ, বাণী।
গা-ই-ল মাই-কেল মধু মারী-পুতা* মাণী॥

চণ্ডীদাস : পদাবলী (আনুমানিক ১৪০০-১৯৩৫ খ্রিঃ)

সই কিবা সে কঠিন পরিণাম।
নিদারুণ রণমাঝে অকালে মরিল গো,
বীরবাহু গেল বীরধাম॥
না জানিয়ে কত মধু ও বীণায় আছে গো
বীণাপাণি শুনাও মধুর।
সেনার নায়ক করি ভেজিল কাহারে গো
রণথলে রাঘবারি শূর॥
জানিবারে চাই মনে জানা নাহি যায় গো
তুমি মাতা করহ উপায়।
কহে মধু মাইকল যেহু ঝুনা নারিকল
মাকড়ের হাথেতে শোভায়॥

বিদ্যাপতি : পদাবলী (আনুমানিক ১৪০০-১৬৫০ খ্রিঃ)

ভারতি, বহুত মিনতি করি তোয়।
অমিয় বচন তুয়া শুনইতে কাতর
দয়া জানি শুনাওবি মোয়॥
ঘোর সমর মাঝ বীরবাহু পড়ওল
অকালে গেলা যমপাশে।

* মারীপুতা – মারীয়া বা মেরীর পুত্র যিশু।

পুন সেনাপতি করি কাহে ভেজল রণে
রাবণরাজ হতাশে॥
ভনে মধুসূদন শেষ সমনভয়
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
পাপীক পাপভার আপন শিরে ধরাওসি
(জিসু) তারণ ভার তোহারা॥

কৃত্তিবাস : রামায়ণ (আনুমানিক ১৪৩০ খ্রিঃ)
(পরিষৎ-প্রকাশিত ১৫৮০ খ্রিঃ পুথির পাঠানুযায়ী)

বাণেতে জর্জ্জর করি যত বানরগণে।
অবশেষে বীরবাহু মরিল আপনে॥
বীণাপাণি বর মাঞ্জি তুয়াকার ঠাঞি।
কহ এবে কি করিল রাবণ গোসাঞি॥
রণ জিনিয়া বানরকটক ছাড়ে সিংহনাদ।
ত্রাস পাইয়া রাক্ষসগণ গণিল প্রমাদ॥
রাবণ ভাবে পাঠাই এবে কোন ছাওয়ালেরে।
যে যায় সে যায় আর ঘরেতে না ফেরে॥
দত্ত মধুসূদনের মধুর পাঁচালী।
লঙ্কাকাণ্ডে গায়্যা দিল একটি শিকলি॥

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী : চণ্ডীমঙ্গল (আনুমানিক ১৫৮০ খ্রিঃ)

সম্মুখ সমরে পড়ে বীরবাহু বীরবরে
হা কান্দ-কান্দনে সবে কান্দে।
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান
রাবণ উঠিয়া বুক বান্ধে॥
নমহুঁ নমহুঁ বাণী কৃপা কর নারায়ণী
বিষ্ণুপ্রিয়া পূজ পদ্মাসনে।
পুস্তক লইয়া করে উর দেবী এ আসরে
চন্দ্রাননি হাস্যবদনে॥
পুস্তক লইয়া করে উর দেবী এ আসরে
চন্দ্রাননি হাস্যবদনে॥
মিনতি শুন গো শুন সেনাপতি করি পুন
ভেজে কারে শমন সকাশে।
দিবানিশি তুয়া সেবি রচিল সূদন কবি
নূতন মঙ্গল অভিলাষে॥

কাশীরামদাস : মহাভারত (আনুমানিক ১৬৫০ খ্রিঃ)

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি।
বীরবাহু যমপুরে গেলেন যখনি॥
কহ দেবী বীণাপাণি অমৃতভাষিণী।
রক্ষঃকুলনিধি সেই রাঘবারি যিনি॥
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে।
পাঠাইল রণস্থলে অরিকুলবধে॥
মেঘনাদবধ কথা অমৃত সমান।
শ্রীমধুসূদন কহে শুনে পুণ্যবান॥

ভারতচন্দ্র : বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরী (১৭৫০ খ্রিঃ)

১। অকালে পড়িয়া সমুখ রণে।
বীরবাহু বীর মরে যখনে॥
হরষে নাচিল বানরভূতে।
বাপারে কহিতে ভগ্নদূতে॥
নয়নে অঝোর ঝরিল পানি।
বীণাপাণি কহ অমিয়বাণী॥
কাহারে করিয়া সেনার পতি।
পাঠায় রাবণ অথিরমতি॥
বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥
দেখে-শুনে কয় মধুসূদন।
এমন জানিলে লিখিত কোন্—॥

২। রাঘব হানিল মরণবাণ,
বীরবাহু ভূমে পড়ে সটান,
অকালে যমের বাড়িতে পান
চরম বরণমালিকা।
কি হল তখন কহ ভারতী,
মধুর বচন শুনিতে মতি,
কাহারে পাঠাল লঙ্কাপতি,
ফুরাতে জীবনতালিকা।
রাম-রাবণের সমরগীতা,
কারো লাগে মিঠা কাহারো তিতা,

শ্রীমধু রচিল ফুলকবিতা,
কবিতা রসের শালিকা।

৩। সম্মুখে সমরে পড়ি অকস্মাৎ গেল মরি
যবে বীরচূড়ামণি বীরবাহু অকালে।
কহ দেবী বীণাপাণি অমিয় মধুর বাণী
আরো ছিল রাবণের কত দুখ কপালে॥
কারে সেনাপতি পদে বরি ভেজে অরি বধে
আপনার দোষে আহা বংশশুদ্ধ মজালে।
শ্রীমধুসূদন কয় অতি ছন্দ ভালো নয়
কবিরা ছন্দের জালে দেশটাকে ঠকালে॥

রামপ্রসাদ : শ্যামাসংগীত (১৭৫০ খ্রিঃ)

রসনায় কালী কালী বলে,
বীরবাহু বীর গেল চলে।
অকালেতে মরল পুড়ে কালীভীষণ রণানলে॥
কালী বলে কও মা বাণী,
শুনতে মাতাল আমার প্রাণী,
সেনাপতি কায় বা করে রাবণ ভাসে নয়ন জলে॥
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
মদ মাতালে মাতাল বলে।
আমি মাতাল হয়ে তোমায় খেয়ে ডুবব কালী রসাতলে।
সূদন বলে দোটানাতে পড়ে জীবন যায় বিফলে॥

রামমোহন রায় : ব্রহ্মসংগীত (১৮৩০ খ্রিঃ)

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কয় কিন্তু বীরবাহু নিরুত্তর॥
পড়িতে সম্মুখ রণে, রাক্ষসপতি রাবণে।
কাহারে পাঠাবে পুনঃ ভাবিয়া কাতর॥
গৃহে হায় হায় শব্দ, ভয়েতে রাক্ষস স্তব্ধ
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিম-কলেবর॥
ভাব সেই নিরঞ্জনে, নাহিকো ভীতি মরণে
চিন্ত সত্য পরাৎপর সত্যেতে নির্ভর॥

অজ্ঞাত ভাটিয়াল (১৮৫০-১৯৩৭ খ্রিঃ)

ওগো বন্ধু, আমার মন কেন উদাসী হইতে চায়।
এগো ডাক শোনে না বীরবাহু গো সাতসাগরে চইলে যায়॥
এগো চোখা-চোখা রামের বাণে
নদীর পরান সাগর টানে ;
এগো ভাটি সোঁতে ভাটার গড়ান,
জৈবন-জোয়ার তান না পায়॥
বাণী, তুমি দাও মন্ত্রণা,
রাবণ-রাজার কি যন্ত্রণা,
সমুদ্দবে কায় বা ঠ্যালে
শীতল বাতাস লাগায় গায়॥

বঙ্গলাল · পদ্মিনী, কর্মদেবী প্রভৃতি (১৮৫৮ খ্রিঃ)

ঠুকে তাল	আঁখি লাল	কি করাল	মূর্তি।
মহাকায়	সিংহ প্রায়	যেন পায়	স্ফূর্তি॥
চলে যায়	পদ-ঘায়	বসুধায়	কম্প।
কভু ধায়	ঠায়-ঠায়	মেরে যায়	ঝম্ফ॥
লুটপুট	দেয় ছুট	মরকুট	ত্রস্তে।
হত-আয়ু	বীরবাহু	রাম-রাহু	হস্তে॥

* * *

কোথা বাণী সরস্বতী সুধাস্বরূপিণী।
কেন গো আমার প্রতি এরূপ কোপিনী॥
তুয়াপদ সরসিজ পরিহরি আমি।
হইয়াছি বিফল চিন্তার অনুগামী॥
তুমি বল তারপর রাবণ কি করে।
সেনাপতি করে যত ততো-ততো মরে॥

* * *

জ্বলি উঠে রাবণের হৃদয়-নিলয় হে, হৃদয়-নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে, বিলম্ব কি সয়॥
চল-চল-চল সবে, সমর-সমাজ হে, সমর-সমাজ।
রাখহ সোনার লঙ্কা, রাক্ষসের কাজ হে, রাক্ষসের কাজ॥
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়॥

দীনবন্ধু : "বাত পোহাল ফরসা হল" প্রভৃতি কবিতা (১৮৬০ খ্রিঃ)

সাম্‌নে যুঝে বীরবাহু যে হলেন কুপোকাৎ।
থাক্‌তে আয়ু পরান-বায়ু উধাও অকস্মাৎ॥
কও ভারতী শুন্‌তে মতি মিষ্ট অতি বাণী।
পাঠায় রণে কোন্ সে জনে সৈন্যপতি মানি॥
রাবণ রাজা কঠিন সাজা দিতে রঘুর নাথে।
পাপ-সমরে আপনি মরে ফল যে হাতে-হাতে॥

মাইকেল (আত্মহত্যা) "বঙ্গভূমিব প্রতি" (১৮৬২ খ্রিঃ)

রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
চটুল ছন্দেব সাধ,
ঘটাবে কি পরমাদ —
বধিতে চাহিছে প্রাণ, কাব্য মেঘনাদ-বধে!
লঙ্কায় দৈবের বশে
জীবতাবা যেই খসে,
বীরবাহু দেহ হতে পড়ে চিরামৃত হ্রদে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে—
জেনেও রাবণপুরী মত্ত অহঙ্কার-মদে।
সেনাপতি কোন্ জনে
পাঠাল আবাব রণে,
বল মাতা বীণাপাণি, ভারতি, বাণী-বরদে!
অনেকে আসিবে-যাবে,
তোমার প্রসাদ পাবে,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।

হেমচন্দ্র : কবিতাবলী (১৮৭০ খ্রিঃ)

'আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষু মেলি'
চেয়ে দেখ কাঁদে রাক্ষস-মণ্ডলী—'
বানরকটক শোনে কুতূহলী
বীরবাহু তবু ঘুমায়ে রয়।
'বাজ রে সিঙ্গা বাজ এই রবে'—
আর কি লঙ্কায় সেইদিন হবে?

সমগ্র জগৎ জাগে কলরবে
বীরবাহু শুধু ঘুমায়ে রয়।
'রুল অযোধ্যিয়া' উঠে চিৎকার,
সুদূর পশ্চিমে ছাড়িয়া গান্ধার—
এ বঙ্গে সারদা নাহি কি রে আর,
থাকিলে, জননী, কোথায় তুমি?
হেথা, চণ্ড আরাবে খেলিছে ভৈরব
অস্থিভূষণ গলে
ঠঠঠং ঠঠ নর-কপাল
শ্মশান-ভূমিতে চলে।
চলে কপাল ধধধ ধঃ কার মাথা এটা হিহিহি হঃ
ধাকিটি-ধিকিটি ধিমিয়া-ধিমি।
ছিন্ন হইল বীরবাহু চন্দ্রে গরাসিল রাহু
দশানন বিরস বদন—
বল মাতা বীণাপাণি কারে সেনাপতি মানি
তারো পরে চালাইল রণ।
'রে বেটা রে বেটা' বলি কাঁদিল না মহাবলী
ভীমমূর্তি রুদ্রমূর্তি লুটাল না সে ভূমে—
কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে?

নবীনচন্দ্র : পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫ খ্রিঃ)

অযোধ্যার রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া রণস্থল
কাঁপায়ে সাগর-জল
কাঁপাইয়া স্বর্ণলঙ্কা উঠিল সে ধ্বনি।
পড়িল সে বীরবাহু কটক-ভিতরে
বানরের বাচ্চাগণ
করিলেক আস্ফালন
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

'দাড়া রে! দাঁড়া রে ফিরে দাঁড়া রে রাক্ষস!'
নূতন কে সেনাপতি
পেয়ে রাজ-অনুমতি
গর্জিল, গর্জনে কাঁপে শূন্য দিগ্‌দেশ।

'কি আশ্চর্য!' 'একি কাণ্ড!' বীণাপাণি, মধুভাণ্ড
এমন করিয়া ভাঙে হাটের মাঝার?
'প্রিয় হেনরিয়েটা আমার!'

বিহারিলাল : বঙ্গসুন্দরী, সারদামঙ্গল প্রভৃতি (১৮৭০-১৮৭৯ খ্রিঃ)

রাবণের হু-হু করে মন,
বীরবাহু করে মহারণ,
অকালে যমের দেশে
হায় সে পড়িল শেষে,
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ যেমন।

* * *

বল গো মা বাণী বরদা সুন্দরী
কমল-আসনা স্বরগ-জলে,
সেনাপতি পদে কোন বীরে বরি
রাবণ পাঠায় বানরদলে।

* * *

তুমি আন মত্তদশা,
খালি পেটে কাব্য চষা,
আঁধারে খদ্যোৎ যেন ধিকি-ধিকি জ্বলে,
খাবি খায় ক্ষীণ প্রাণ,
তবু শুনি সুরতান
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ-মণ্ডলে।

বঙ্কিমচন্দ্র : "বন্দে মাতরম্" (১৮৮২ খ্রিঃ)

বন্দে মাতরম্।
শতদলবাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
লঙ্কাকাণ্ডে বীরবাহু পতিতম্
ভগ্নদূত রাবণেরে কথিতম্
পুত্রে কহ মাতা কাহিনী অতীতম্।
কাহিনী ত্রেতা দ্বাপরম্।

দশাননকণ্ঠহাঁউমাউনিনাদকবালে,
কোন্ সেনাপতি ভুজে দানিল খবকববালে,
ভাবতি, তুমি মা দেহ বলে।
বল বীণাধাবিণীং দুর্গতিভাবিণীম্
ছন্দসংকাবিণীং মাতবম্।
কলমে তুমি মা শক্তি,
লিখে যাই পাঁক্তি-পাঁক্তি
গড়ি তব হাড়িকাঠ মন্দিবে মন্দিবে।

কামিনী বায় আলো ও ছায়া (১৮৮৯ খ্রিঃ)

বীববাহু মহাবণে ডালি দিলে এ জীবন,
সেনাপতি কবি কাবে পাঠাইল দশানন ,
হাসিবাব-কাঁদিবাব অবসব নাহি তাব,
সে কাহিনী বল্ বাণী, মা আমাব, মা আমাব।

আঁধাবের কীটাণুবা দুদণ্ডেই লয় পায়,
ভাবিযা না পায় কেহ কেন আসে কোথা যায়,
আলোকেব শিশু মোবা বণাঙ্গন এ সংসাব—
ছাযা তাই নামে চোখে, মা আমাব, মা আমাব।

গিবিশচন্দ্র পাণ্ডব গৌবব (১৯০০ খ্রিঃ)

নাবায়ণ—নাবায়ণ।
বীববাহু আয়ু না ফুবাতে
হল বাহুগত ,
শমন-সদনে বণে প্রেবণ কবেন নাবায়ণ।
অকাবণ জানকীহবণ
কবিয়া বাবণ—
আপনি ডাকিয়া আনে আপন মরণ।
কহ বাণী বীণাপাণি, মিনতি আমাব ,
সেনাধ্যক্ষ কারে মানি অতঃপর রাজা দশানন
প্রতিবিধিৎসিতে পুনঃ কৈল মহারণ।
নাবায়ণ, নারায়ণ।

রবীন্দ্রনাথ : "মরণ" (১৯০১ খ্রিঃ)

হায় এমনি করে কি, ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
দিলে বীরবাহু-চোখে ঘুমঘোর,
রণে প্রাণ করি অপহরণ!
বাণী! ধীরে এসে তুমি দাও দোল
মোর অবশ বক্ষ-শোণিতে,
আমি তুলিব কাব্য-কলরোল
তব সুমধুর বীণাধ্বনিতে।
গাব রাবণ কাহারে দিল কোল,
রণে, কে করিল অবতরণ—
মোর মাথা নত করে তুমি দাও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

যতীন বাগচী : রেখা, নাগকেশর (১৯১২-১৯১৭ খ্রিঃ)

আজ সোনার লঙ্কা রোদন-জুয়ারে
অকূলে ভাসিয়া যায়—
আর 'ফুল চাই—চাই কেয়াফুল'-হাঁকে
প্রেমিক ফিরে না চায়।
ওই রামের নিঠুর শরে,
ওই বীরবাহু ভূমে পড়ে,
ওই রাবণ তাহারও পরে
কাল-সমরে পাঠাবে কায়—
মোরে মধুর কাহিনী শোনাবি বীণায়
বীণাপাণি, নেমে আয়।
তোরে শিরীষ ফুলের পাপড়ি খসায়ে
পরাগ করিব দান,
তোরে রজনী-গন্ধা-গেলাস ভরিয়া
অমিয়া করাব পান।
হোথা রাক্ষস-বধূ কাঁদে,
জলে নয়ন তাহার ধাঁধে ;
হাত রাখি ননদীর কাঁধে
বলে, ঠাকুরঝি, তারে আন্!
শুনে সাগরের ডাক ছুটে বাহিরায়
দয়িতের আহ্বান?

দ্বিজেন্দ্রলাল : ভাবতবর্ষ (১৯১৩ খ্রিঃ)

যে-দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে পুচ্‌কে স্বর্ণলঙ্কা,
কে জানিত বল তোমার রাবণ হইবে দেবতা-মানব-শঙ্কা।
রাবণাত্মজ বীর বীরবাহু অকালে যখন ফুঁকিল শিঙা,
মর্কট লাগে কর্বুব পিছে ধ্বাঙ্ক্ষ্ব পিছে যেমন ফিঙা।
কহ বাগ্‌দেবীর পুনঃ দশানন বাজাল কেমনে সমর-ডঙ্কা,
সেনাধ্যক্ষ করিল কাহাবে রাখিতে আপন স্বর্ণলঙ্কা।

সত্যেন্দ্রনাথ : "ঝর্না" (১৯১৩ খ্রিঃ)

লঙ্কা! লঙ্কা! সুন্দরী লঙ্কা!
মিত্রের আশ্রয় শত্রুর শঙ্কা!
অঞ্চল সিঞ্চিছে চঞ্চল সিন্ধু,
তরঙ্গ-ললাটে সুস্থির বিন্দু,
সমুদ্র-শম্ভুর ভালে শশী বঙ্কা,
লঙ্কা!

হলে রাম-অস্ত্রে বীরবাহু ঠাণ্ডা,
বাগ্‌দেবী বল কোন্‌ রাক্ষসে পাণ্ডা
করতঃ রাক্ষস-রাজ স্বহস্তে
প্রেরি প্রারম্ভে অন্তিমে পন্তে—
কিষ্কিন্ধ্যাদলে শব্দিত ডঙ্কা,
লঙ্কা!

কর্ছি যে অজস্র ইয়ার্কি ছন্দে,
নির্ঝর ঝুর্‌ঝুর্‌ কভু মেঘমন্দ্রে ;
কাব্যের নামে দিই দুর্দম ধাপ্পা,
ভগবতী ভারতী নাহি হও খাপ্পা—
মিলে না ছন্দ-মিলে টাকা-সিকে-টঙ্কা
লঙ্কা!

কুমুদরঞ্জন : "তরী হেথা বাঁধবনাকো" (১৯১৪ খ্রিঃ)

মাঝি,
তরী হেথা বাঁধ্‌বো নাকো আজ্‌কে সাঁঝে।
ভিড়িয়ো নাকো চলুক তরী নদীর মাঝে॥
ঐখানে ঐ মাঠের কাছে
নর-বানরে যেথায় নাচে,
বিজয়-নাচন দেখে তাদের, রাবণ-বুকে বড়ই বাজে॥
ঐ মাঠের ঐ মাঝখানেতে বীরবাহু যে যুদ্ধে গিয়া,
মরে গেল রামের বাণটি রোমশ তাহার বক্ষে নিয়া,
মিঠে সুরে বল্ তো মাঝি
রাবণ কারে পাঠায় আজি,
আহা, বাছার মুখখানি তার দেয় যে বাধা সকল কাজে।
তরী হেথা বাঁধ্‌বো নাকো আজ্‌কে সাঁঝে॥

নজরুল ইসলাম : "বিদ্রোহী" (১৯২১ খ্রিঃ)

বল বাণী
আজি কাতর মম প্রাণী।
রণ- অঙ্গনে যবে বীরবাহু লভে মুক্তি জীবন দানি।
বল বাণী।
ক্রোধে রাক্ষসরাজ দশানন জ্বলে,
সেনাধ্যক্ষ কে সে রণে চলে ;
ভূলোক-দ্যুলোক-গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন আরশ্ ছেদিয়া,
মধুসূদনের লেখনীতে ধরা পড়ে সেই আফ্‌শানি ;
বিংশ শতকে বঙ্গে প্রচার সেই ছন্দের পঞ্চাশো কপ্‌চানি।
বল বাণী।

যতীন সেনগুপ্ত : "ঘুমের ঘোরে" ইত্যাদি (১৯২৩ খ্রিঃ)

এস তো বন্ধু, আবার আজিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা
মরিল যুদ্ধে বীরবাহু বীর তারো পরে আছে কথা।
মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি।

রণভূমি নিঃঝুম
বীরের নয়নে নামিয়া আসিল মরণ-গভীর ঘুম।
তুমি বীণাপাণি, জানি হে বন্ধু, অনেক করেছ লীলা—
প্লীহারে করেছ যকৃৎ বন্ধু, যকৃতে করেছ পিলা ;
হয়ত বলিতে পারিবে রাবণ কি করিল তারো পর—
সেনাপতি করি পাঠাল কাহারে রাখিতে আপন ঘর।
নারিবে বলিতে তবুও বন্ধু, বলিতেছি কানে-কানে—
হাতুড়ি পেটার পূর্বে লোহারে আগুনে দেওয়ার মানে।
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে,
ইয়ার্কি তব মিছে—
রাত্রির পরে দিবস বন্ধু, দিন রাত্রির পিছে।

মোহিতলাল : বিস্মরণী (১৯২৬ খ্রিঃ)

নভোনীল বেদনায়! গূঢ়রক্ত হরিত-শ্যামল!
ধূসর উদাস যেন পৃথিবীর পঞ্জর-পাষাণ!
স্থলে-জলে অন্তরীক্ষে আত্মরক্ষা করে জীবদল—
নিয়ত সংগ্রামশীল, বাজিতেছে কালের বিষাণ।
বানরেরা চাহে লয়—রাক্ষসেরা মরণ-পাগল ;—
সহস্র মৃত্যুর পরে উড়ে রাম-প্রণয়-নিশান—
সেই যজ্ঞে অবশেষে বীরবাহু-জীবনের মহা-অবসান!

ভাবনা-কুঞ্চিত ভাল দশানন অঞ্চল হিয়া—
ললাটের স্বেদ মুছি নেহারিল স্তিমিতলোচন
নবহোত্রী চলিয়াছে—হে ভারতি, ছন্দে মোহনিয়া
মৃত্যুর অমৃতরূপ—মরজনে করাও শ্রবণ!
বিস্মরণী রীতি তার স্বপন-পসরা তাই নিয়া
আত্মঘাতী যুগে-যুগে! সুন্দরের করে আরাধন
সনাতনী প্রকৃতির পয়োধর-সুধাবিষে—জীবন-মরণ!

পুনর্বসন্ত

আবার যুগল পায়ের চিহ্নে শ্যাম-তৃণদল পড়িছে ঢাকা,
নদীতীরবাহী প্রান্তরে পুনঃ নব পথরেখা উঠিছে জেগে,
জাহ্নবীবুকে লঘু মেঘছায়া মায়া-মনোহর সৃজন করে,
সন্ধ্যার বায়ে ভাসিয়া আবার আসিছে শ্রবণে হারানো সুর।

তুমি একদিন ধরেছিলে হাত, স্মরণে কি আছে সন্ধ্যা সেই?
ধূলি ও ধোঁয়ায় কালো শহরের মাথায় আকাশে গোধূলি-রঙ,
ঠিক মনে হল, মুমূর্ষু দিবা বিদায়ের হাসি উঠিল হেসে—
শূন্যে উধাও ছুটেছিল যেন লাইনে বদ্ধ ট্রামের চাকা।
সহজ স্নেহেতে আপনার হাতে নিয়েছিলে মোর হস্তখানি,
জানিতে কি সখি, সে পাণি কখনো হবে না পীড়িত মন্ত্রপাতে?
গঙ্গার জলে একজোড়া মুখ তড়িৎ-আলোকে ফেলিছে ছায়া,
কাঁপা কাঁপা জলে পড়িতে সেদিন পেরেছিলে ছায়া-মুখের ভাষা?
মনের ভাষা তো পড়িতে শিখিনি, মনে আছে শুধু গানের ভাষা।
কে জানে কখন কোন্ ভাবাবেশে সুরে গাঁথে কথা বিশ্বকবি—
তাঁরি জবানিতে প্রশ্ন-আতুর মন পেয়েছিল জবাব বুঝি,
তোমার মনেতে কি ছিল হয়তো জানিতে আজিও পারিনি তাহা।
তারপর এল শ্রাবণ-রাত্রি, অমা-যামিনীর অন্ধকারে
উদ্যতফণা ফণীও করিল সংহত তার দশন-লীলা।
মনের কামনা মনে রয়ে গেল, দেহের মিলন বাতাসে কাঁপে,
তুমিও বুঝিলে, আমি বুঝিলাম, নিঃশ্বাস এল রুদ্ধ হয়ে,
ক্ষণ-ইতিহাস ভেসে গেল সখি, বিরাট কালের স্রোতের জলে,
মহাসমুদ্রে প্রবাল হইয়া হয়তো কোথাও জাগিয়া আছে।
তুমি কি চেয়েছ, আমি কি চেয়েছি, ফিরে পেতে সেই হারানো ক্ষণে,
বাঁকা ঠোঁটে তব হাসির রেখাটি বেদনা গোপন বহে কি আজো?
অনেক সয়েছি, ভুলে গেছি কথা—কথাহীন সুর মরমে জাগে
ঠোঁটে ঠোঁট আর বুকে বুক মিলে চাপিয়া মারেনি গানের সুর।
হায় সখি হায়, অধরা রহিলে চাহিতে যে ধরা রঙিন মন—
বিফল প্রয়াসে শোণিতবিন্দু ভুলিতে চাহেনি সিন্ধুভাষা।

আকাশ-সাগর মিলিল না আজো তাই ওঙ্কার শূন্যে বাজে,
তাই রবিকরে সাগরের জল মেঘের শোভায় আকাশ ঢাকে।
তুমি ঢাকিয়াছ আমার আকাশে, আমিও ফেলেছি তোমাতে ছায়া,
ধারাবর্ষণে কাঁদিয়াছি কভু, সাগরের ডাক শুনেছি বুকে,
নিশীথশয়নে জাগিয়া চকিতে খুঁজেছি তোমারে পাইনি কাছে—
বহুদূরদেশে মন ছুটে গেছে কমলালেবুর সোনালি বনে,
ডিঙায়ে গিয়াছে মসমাইধারা, উপলবহুল ডাউকি নদী।

আবার যুগল পায়ের চিহ্নে শ্যামতৃণদল পড়িছে ঢাকা,
হারায়েছি যাহা করি নাই দাবি, সে কি আর সখি ফিরিয়া পাব?
জল উবে গিয়ে জলই হয় জেনো, মন কোনদিন হয়.না দেহ—
হাতে হাত রাখা প্রেমে কভু সখি স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরে না বুকে।
দুই স্রোত আসি এক হয় যদি, তবেই সাগরে নদীর গতি,
অবিরাম চলে, তাই তো সময় অসময় হয়ে ওঠে না কভু—
শ্মশানের চরে পলি পড়ে পুনঃ সবুজ ফসল গজিয়ে ওঠে।

বিরহচিতার আগুনে পুড়িয়া নবরূপ ধরি জেগেছি মোরা—
ভয় পেওনাকো, দুয়ার এখন মৃদু করাঘাতে খুলিয়া যাবে।
পাইনের বনে পথ ভুলে পথ চকিতে সেদিন খুঁজিয়া পেলে,
মরু-বালুকায় পথ যে হারায় মরীচিকা তার আশা যে শুধু।
আবার যুগল পায়ের চিহ্নে শ্যামতৃণদল পড়িছে ঢাকা,
কাছে এসো সখি, চুলের গন্ধে বিবাগী মনেরে ঢাকিয়া দাও।
দেহ আর মন চলে পাশাপাশি বুঝিতে পারিনি সেদিন ইহা—
দেহের শুচিতা বাঁচাইতে গিয়ে রুদ্ধ করেছি মনের দ্বারও।
কাছে এসো সখি, ভুলে-ভুলে আজ আসল কথাটি পড়েছে ধরা—
আবার যুগল পায়ের চিহ্নে শ্যামতৃণদল ফেলিব ঢাকি।

বিলম্বিনী

বহু বিলম্বে আসিয়াছ তুমি, তবু আসিয়াছ এই তো ভালো ;
তৈলবিহীন প্রদীপে দেখ তো জ্বলে কি না জ্বলে নতুন আলো।
স্তিমিত হয়েছে যৌবনশিখা—মনের খবর লয় না কেহ,
আমি শুধু জানি অন্তর-তাপে হয় কি না হয় তাপিত দেহ।
তুমি জ্বলিতেছ আপনার তেজে, ভস্ম ঠেলিয়া আগুন-জ্বালা
পাবে কি দেখিতে—চারিদিকে তব জ্বলিছে আরতি-দীপের মালা।

শঙ্খ-ঘণ্টা সঘনে বাজে,
জোনাকির আলো কে পায় দেখিতে সহস্রশিখা মশাল-মাঝে!

বহুদিন হল ক্যারাভান সাথে মরু-অভিযানে যাত্রা করি,
শত ওয়েসিস পার হয়ে শেষে মরু-মরীচিকা-চিহ্ন ধরি—
ঝড়ে ও আঁধিতে, বালু-ঝটিকায় পৌঁছিনু যেথা ভগ্ন দেহে—
মরুর প্রান্তে নহে গ্রামখানি, টানিছে না কেহ স্নিগ্ধ স্নেহে ;
জলকণাহীন পাদপবিরল দগ্ধ পথের অভিজ্ঞতা
সম্বল শুধু ; উদার আকাশ, কেহ নাই পাশে কহিতে কথা—
করুণার মতো রজনী নামে,
রহি-রহি শুধু পেতেছি শুনিতে ডাকে সারমেয় ডাহিনে-বামে।

তুমি আসিয়াছ ভালোই করেছ, কাছে এসে বস, তিমির-রাতি
যাপিতে হইবে হাতে হাত বেখে,—দেহ-দীপাধারে জ্বেলো না বাতি,
আঁখি-তারকায় অগ্নিশিখায় দিও না জ্বলিতে তীব্র তেজে,
ঝিঁঝির ঝাঁঝর তাও থেমে যাবে বিরামবিহীন খানিক বেজে ;
শুধু হাতে হাত, নিবিড় তিমিরে পড়িতে পাব না মুখের ভাষা,
তুমি না জানিবে আশঙ্কা মম, আমি জানিব না তোমার আশা ;
রাত্রি গড়াবে প্রভাত পানে,
তন্দ্রা যদিই নেমে আসে চোখে টুটিবে তন্দ্রা পাখির গানে।

পিছন ফিবিয়া খুঁজো না কিছুই, হাতে যাহা ঠেকে তাহাই লহ,
আমার অতীত ভবিষ্যতের তুমি হইও না বার্তাবহ।
সন্ধ্যা-উষায় আজো ক্ষরে মধু, নদীতরঙ্গে সূর্য হাসে,
শুষ্ক ফুলের মধু-পান-লোভে আজো প্রজাপতি উড়িয়া আসে,—
তুমি আসিয়াছ ভালোই করেছ, এ ধরণীতল নবীন আজো,
পথের ধুলায় আমি সাজিয়াছি, ফুল-পরিমলে তুমিও সাজো।
এসো কাছে এসো বিলম্বিনী,
নূতন বঁধুরে যদি চিনে থাক পুরানো বধুরে আমিও চিনি।

বেলা বয়ে যায়, আঙিনায় ছায়া পড়িয়াছে দেখ দীর্ঘ হয়ে,
দিনের আলোয় মনের আঁধার এখনো হয়তো আসিবে ক্ষয়ে ;
তুমি গাবে গান, আমি তব নাম আখর গনিয়া ছন্দে গাঁথি,
চকিতে চাহিয়া দেখিব আকাশে উড়ে চলিয়াছে বকের পাঁতি।
ভৈরবী তব পূরবী হইয়া বাজিয়া উঠিবে ছন্দে মম,
দিনের সূর্য নিবে যায় যদি, রাতের চন্দ্র হরিবে তম।
আশা-আকাঙ্ক্ষা জ্যোৎস্নারাতে
এক হয়ে ঝরি রজতধারায় নিদ দিবে আনি আঁখির পাতে।

আর বিলম্ব করিও না, যদি আসিয়াছ এসো নিকটে আরো,
কাল-নদীজল বহে ক্ষুরধার, তুমি বিলম্ব করিতে পার ;
আমার আকাশে রৌদ্রশীতল মেঘে-মেঘে রঙ দিতেছে এঁকে,
দীপ্তি তোমার প্রখর ঠেকিলে গুণ্ঠনে দিব মুখটি ঢেকে,
দিবা-চপলতা রাতের কবিরে যদি বা মুখর করিয়া তোলে—
অসহ হবে না, জানি যৌবন ভুলিবার যাহা সহজে ভোলে।
দিবা-অবসান যখন হবে,
জানি ঘুচে যাবে ব্যবধান-বাধা তিমির-তীর্থ-মহোৎসবে।

গোধূলিলগন এখনো আসেনি, প্রহরখানেক রয়েছে বাকি,
তব সিঁথিমূলে সিন্দূররেখা অস্তসূর্য দিবে কি আঁকি।
কণ্ঠে পরিবে সন্ধ্যামালতী অথবা রজনীগন্ধা-মালা।
প্রভাতের ফুল আমার তো নহে, পার যদি এনো ভরিয়া ডালা।
মন-বিনিময় হয় যদি তবে ফুল-বিনিময় হবেই জানি,
দিনের দীপ্তি মোর পূজাঘরে শোভিবে আরতি-দীপের দানি।
স্নিগ্ধ তিমির ভালো না লাগে,
ঘুমায়ে পড়িও—শশীহীন নভে জেনো অতন্দ্র তারকা জাগে।

ভুলের খেয়ালে যদি এসে থাক, ভুল করে এসো নিকটে আরো,
কোনো ভয় নাই, পুবের আকাশে সন্ধ্যাতিমির হতেছে গাঢ়,
আলোর পাখিরা ব্যাকুল পাখায় একে-একে হের ফিরিছে নীড়ে,
রবি ডুবে যায় সমুদ্রবুকে, নিশি মনোহর জাগিছে ধীরে,
মিলনের বাঁশি বাজিবে গগনে, বাহুপাশ হবে নিবিড়তর,
সন্ধ্যামালতীমালা পর গলে, রজনীগন্ধা খোঁপায় পর।
আরো কাছে এসো বিলম্বিনী,
কেটে গেল দিন পরিচয়হীন, নিশীথ-তিমিরে লইব চিনি।

ক্ষণ-শাশ্বতী

তুমি মহারানী, আঘাত করিলে রুদ্ধ ঘরেতে মম
খুলে গেল সব দ্বার—
প্রবেশিল ঘরে তরল-উজ্জ্বল জ্যোৎস্না সে নিরুপম
কাটিল অন্ধকার।
তিমির-পিপাসী হৃদয় আমার,
চোখে ধাঁধা আনে আলোক-বিথার—

পীড়িত নয়ন মেলিয়া তোমার
চাহিনু মুখের পানে,
মনে হল যেন দেখেছি কোথায়
কে জানে সে কোন্‌খানে।

মোর পানে তুমি বাড়াইলে হাত মুখে অতি মৃদু হাসি
অচেনা হল না মনে,
কোন্ যৌবনে কোন্ বন্যায় গিয়েছিনু দোঁহে ভাসি
শেষে এনু গৃহ-কোণে।
স্রোতের ধারায় নৃত্যের তালে
তুমি ভেসে গেলে সে কোন্ সকালে,
কোন্ ফুলবনে কোন্ আলবালে
সেচন করিলে বারি—
এলে এতদিনে তুমিই কি সেই
সে কথা বুঝিতে নারি।

ভাবি কাজ নাই, মনে জাগে ভয় চরণের শ্লথ গতি,
এ আঁধার ভালো লাগে ;
তুমি যদি সেই ক্ষণিকা আমার ত্রস্ত চপলমতি,
ডাকিতেছ অনুরাগে,
আমি কি পারিব এতদিন পরে
দখিন পবনে বরিতে আদরে,
পারিব খেলিতে মরু-বালুচরে
মরীচিকা-ধরা খেলা?
চির-চেনা তবু হে অপরিচিতা,
এলে যে স্তিমিত বেলা!

তুমি কি আমার মনের শঙ্কা করেছিলে অনুভব
মনের সে দ্বিধা মোর?
কহিলে না কথা হে চপলা, তুমি করিলে না কলরব ;
মুগ্ধের মোহ-ডোর
দিলে না ছিঁড়িয়া কঠিন আঘাতে ;
শান্ত-স্নিগ্ধ দুটি আঁখিপাতে
জ্যোৎস্না-ধবল যামিনী-শোভাতে
বন্দীরে দিলে ডাক—
মনে হল সব প্রয়োজনহীন,
পিছেই পড়িয়া থাক্।

তুমি ছুটে গেলে আলেয়ার মত আমি ছুটি দিশাহারা
শিখা তব অনুসরি—
পিছন কখন লেপে মুছে গেল গাঢ় কুয়াশার পারা
দূর প্রান্তব 'পরি।
দীপ্তি তোমার সব দিবে ঢাকি,
আমি পতঙ্গ কাছাকাছি থাকি
পাখা পুড়ে যাবে একদিন তা কি
জানি না ভাবিছ মনে?
জানি, তবু হায় ছুটিয়া চলেছি
বিফল অন্বেষণে।

জানি মহারানী, তব মনখানি তুমি দিবেনাকো ধরা
এ চলার নাহি শেষ,
আজ মনে হয় ম্লান ছায়াময় আমাব বসুন্ধরা,
আমি তো ছিলাম বেশ।
ইঙ্গিতে ডাকি আনিলে বাহিরে
চাহি না দেখিতে পশ্চাতে ফিরে
সমুখে আমায় নিয়ে চল ধীবে
নূতন আলোর দেশে—
বাঁধিতে দিও না গৃহ-কোণ মোরে
পথে পুন ভালোবেসে।

জানি একদিন তোমার ইশারা হারাব পথের মাঝে
থামিবে আমার চলা,
তুমি কি আবার দেখা দিবে মোরে নবতন কোন সাজে
পাতিয়া নূতন ছলা?
গৃহসুখলোভী ভীরুরে আবার
করিবে বাহির ভাঙি গৃহদ্বার,
এমনি ঘটিবে কত বার-বার
কে দিবে বলিয়া মোরে—
আলেয়া-বিলাস ভালো নাহি লাগে
বাঁধ সুকঠিন ডোরে।

তুমি একবার দাও ধরা দাও, বস এ-সিংহাসনে
ক্ষণ হও শাশ্বতী,
এক হয়ে যাক নিকট সুদূর, তুমি এসে গৃহ-কোণে
জ্বালাও সন্ধ্যারতি।

ঘরে ও বাহিরে দ্বন্দ্ব ঘুচাও
তপ্ত পথের ক্লান্তি মুছাও
ইশারা ছাড়িয়া একবার চাও
আয়ত নয়ন মেলে—
শাশ্বতীরূপে এসো চঞ্চলা,
শান্ত চরণ ফেলে।

দেহার্ণব-তন্ত্র

জীবনের জয়গান করিতেছি ভরি প্রাণ,
যেহেতু জীবনে বেঁচে আছি,
মৃত্যুর কালো ছায়া খনে-খনে রচে মায়া,
জীবনেরে ভালোবাসিয়াছি।
তাই তো করি না ভয়, দেহ উন্মুখ রয়,
দেহ-সংযোগ বিনা জীব সম্ভব নয়,
হে প্রেয়সী, বারে-বারে ফিরে আসি তব দ্বারে
তোমার করুণা তাই যাচি।
চিরিয়া-চিরিয়া চুল বিচার সূক্ষ্ম-স্থূল
করিবারে চাও যদি বার-বার হবে ভুল,
অসহায় দুটি দেহ তাতে নাই সন্দেহ
আসিতেছি তাই কাছাকাছি।
জীবনের জয়গান করিতেছি ভরি প্রাণ,
যেহেতু জীবনে বেঁচে আছি।

ছুটি বিদ্যুৎবেগে ঘর্ষণ মেঘে-মেঘে
তাই তো তড়িৎ-আলো জ্বলে,
মরমের জলধার অবিরল গতি তার
খনে-খনে নয়নে উথলে।
মনে হয় বুকে রাখি সব দুখ দিব ঢাকি—
ঝড়ের আড়াল করে শাবকে যেমন পাখি,
তোমার সকল ব্যথা সংশয়-ব্যাকুলতা
সবখানি যাবে কি বিফলে?
একা যদি একা রয়, মৃত্যুর মহাভয়
জীবনে ক্ষুণ্ণ করি দেহে ক্রমে করে ক্ষয়,

অজানার যত ত্রাস দেহে লভে আশ্বাস
কাটে মেঘ জানি ধারা-জলে।
ছুটি বিদ্যুৎবেগে ঘর্ষণ মেঘে-মেঘে
তাই তো তড়িৎ-আলো জ্বলে।

যা কিছু চিরন্তন তাহাতেই প্রয়োজন
নূতনের ভরসা কোথায়?
সৃষ্টির শুরু হতে ভেসেছি দেহের স্রোতে
মুক্তি তো দেহেরি প্রথায়।
সূক্ষ্ম সেটুকু তব যত হোক অভিনব,
পারে না রচিতে আজো বিবাগী-ভবন-ভব,
স্থূল এই দেহধামে ভোর হয় রাত নামে,
কিছু নাই ওপারে হোথায়।
এই প্রকৃতিরে ঘিরে পড়িতেছি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে
রচিয়া তুষারগিরি গলে যাই আঁখিনীরে,
দেহের জোয়াল-কাঁধে পড়িয়াছি মহাফাঁদে—
কে মায়াবী জোয়ালে জোতায়!
যা কিছু চিরন্তন তাহাতেই প্রয়োজন,
নূতনের ভরসা কোথায়?

দূর হোক সংশয়, হে দেবী, তোমার জয়
যতদিন দেহে রয় প্রাণ,
সুন্দর, দাও ধরা বিপুল বসুন্ধরা
সাধ্য কি করি সন্ধান!
সঁপিলাম আপনারে তব মন্দির-দ্বারে
আলোকে না যদি হয় মিলিব অন্ধকারে,
গণিও না লাভ ক্ষতি—কে অসতী কেবা সতী;
যেটুকু না পাই তাই গান—
সে গান রহিল লিখা ছন্দের মরীচিকা,
দেহ-দীপাধারে প্রিয়ে যতখন জ্বলে শিখা
ততোখন উৎসব হাসিগান-কলরব
ভালোবাসা মান-অভিমান।
দূর হোক সংশয়, হে দেবী, তোমার জয়
যতদিন দেহে রয় প্রাণ।

শিহরিছে রোমকূপ ফাটিছে মাটির স্তূপ
প্রাণের দ্বিদল দিক দেখা।

তিমির-তমসা-তীরে দুয়ে ভাসি আঁখিনীরে
তুমি একা আমিও তো একা।
ধাবমান কালো জল ডাক দেয় অবিরল
সেথা নাই আশ্রয় জানি সেথা নাই তল
আছে কি সীমানা কোনো শোন প্রিয়ে তবে শোন,
সীমানা—দেহের সীমারেখা ;
সেই সীমানায় মোরে চিরদিন রেখো ধরে,
ফিরে আসি বার-বার, বার-বার মরে-মরে
বিরহের মহাভয় আনে যদি সংশয়,
তবে সার্থক গান লেখা।
শিহরিছে রোমকূপ ফাটিছে মাটির স্তূপ
প্রাণের দ্বিদল দিক দেখা।

এসো এসো কাছে এসো বুক ভরে ভালোবেসো
অধরের খুলে দাও দ্বার,
মৃদু-মৃদু কও কানে, "প্রয়োজন নাই গানে,
তুমি শুধু হও আপনার।"
বুকের তপ্তশ্বাস· আমাদের ইতিহাস
বিরহ-মরণ আর বিস্মরণের ত্রাস
রবে আমাদের সাথে, তারপর কার হাতে
আমাদের স্মরণের ভার,
পড়িবে তা নাহি জানি, কত গান কত বাণী,
মৃত্যুর গুহা হতে জীবনের টানাটানি
মায়া-কান্নার জল কত খেলা কত ছল—
ভয় নাই এই সংসার।
এসো এসো কাছে এসো বুক ভরে ভালোবেসো
অধরের খুলে দাও দ্বার।

নবমঞ্জরী

ছেয়েছে আমারে বিপুল বরষা, বহু গুরুগর্জন,
তারি ফাঁকে-ফাঁকে বিদ্যুৎ-বিভা কালো ভুরু-তর্জন
লাভের অঙ্কে লেখা আছে আজো
তোমরা বৃথাই রণসাজে সাজো
অন্তর-মাঝে আজিও বিরাজো—

জীবনের অর্জন।
আমি যে কৃপণ—সাধ্য নাহি তো কিছু করি বর্জন।

আলো-ঝলমল সুনীল আকাশে বর্ণের আলিপনা
রাগে ও বিরাগে প্রেমে ও ঘৃণায় এঁকেছিলে কয়জনা।
খেলিবার ঘুঁটি আমারি এ মন
তোষণ করেছে সবে কিছুখন ;
বিচিত্র রূপে ভরেছে জীবন
বিচিত্র আরাধনা।
রঙছুট কেহ নও তো আজিও, একা আমি বহুমনা।

দিয়েছ অনেক সামান্য নিয়ে, তোমাদের ইতিকথা
বাল্মীকি-ব্যাস লিখিতে পারেনি হোমার-দান্তে, তথা
বঙ্কিম-রবি-শরৎচন্দ্র
তোমাদের স্তবে চির-অতন্দ্র,
বঞ্চিত যারা খুঁজেছে রন্ধ্র,
তাহাদের বাচালতা
স্বপ্নহরের সমাধি-শিলায় লভিয়াছে নীরবতা।

তোমরা নিত্য জোগায়েছ স্নেহ সৃষ্টির আলবালে,
দীপশিখা হাতে দেখায়েছ পথ যুগে-যুগে কালে-কালে।
তোমাদেরি প্রেমে আদিম মানব
মানুষ হয়েছে হয়নি দানব
যুগসঞ্চিত তোমাদের স্তব
স্পন্দিছে নভোভালে।
যা কিছু প্রকাশ তোমরা রয়েছ তাহারি অন্তরালে।

পুরাতন-মূল-শাখা-প্রশাখায় ফোটে নবমঞ্জরী,
বার-বার মোর হয়েছে প্রভাত সুনিবিড় শর্বরী।
মোর প্রবাহের প্রত্যেক বাঁকে
তোমরাই আছ ভরা ঘট কাঁখে—
লক্ষ্য তোমরা—মোরা তারি ফাঁকে
তরী পণ্যেও ভরি।
তোমরাই আদি, তোমরাই শেষ, তোমাদের নতি করি।

তোমরা

১

পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে এল ম্লান হয়ে এল দিন,
ভিতরে-বাহিরে নামিছে অন্ধকার—
কণ্টকময় সংসার-বুকে চরণের দৃঢ় ভার
ক্ষয় ও ক্ষতিতে ক্রমে হয়ে এল ক্ষীণ।
অরণ্যপথে চলিতে-চলিতে অনেক ছলনা হয়েছে সহিতে
অকারণ-ভার অনেক বহিতে হিসাব নাহিকো তার—
চরণের গতি নয়নের জ্যোতি ছাড়ে অতি-অধিকার।
স্তিমিত আঁধারে তোমরা যতনে জ্বালিছ ঘৃতের আলো
হতাশ-পথের তোমরা জোগাও আশা—
ভোরের লক্ষ্যে নিয়ে যায় বলে সন্ধ্যার ভালোবাসা
কাঁটা দলে দলে পথ চলা লাগে ভালো।
তোমাদের মুখে ফুটাইতে হাসি গোপনে কাঁদিতে আজো ভালোবাসি,
হাসি-গানে দাও তোমরাই নাশি বিষাদ সর্বনাশা।
চোখে নাই দেখি কানে যেন শুনি তোমাদের কলভাষা।

নিবিড় বেদনা-বরষার মাঝে কঠিন কাঁটার বনে
শুভ্র কেয়ার গন্ধে যে পাই দিশা।
ক্ষতি কিবা তায় যদি বা ঘনা সমুখে গহন নিশা
ভঙ্গ দিব না ক্লান্ত জীবন-রণে।
মোর মাঝে যেবা চিরজীবী কবি সে যে অনুখন খুঁজিছে সুরভি
তোমাদের মাঝে নিয়ত তা লভি মেটে যেন তার তৃষা—
সুন্দর হোক ধরণী-সরণি গানে ও গন্ধে মিশা।

২

তোমরা রয়েছ পৃথিবীর বুক জুড়ে
এ-ধরা আজিও তাই মোর আশ্রয়,
ফিরে-ফিরে আসি যত চলে যাই দূরে
যত পাই ভয় ততো হই নির্ভয়।

অচেনা তবুও তোমরা আমার চেনা
একটি নিমিষে হয় চির-পরিচয়,
তোমাদের সাথে পুরাতন লেনা-দেনা
ভুলে-ভুলে আজ হোক আরো মধুময়।

ছিল একদিন—করেছিনু ছুটাছুটি
অনেক আশায় ধরণী ছিল যে রাঙা,
ফুল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ফেলেছিনু মুঠি-মুঠি
এক খেলা ছিল—হাতে গড়া হাতে ভাঙা

তোমরা তখন যদি বা আসিতে কাছে
গতির মোহেতে করিতাম অনাদর,
হয়তো আঘাত লাগিত দেহের আঁচে
আলোর জগতে কালো হত চরাচর।

সেদিন আসনি এসেছ তোমবা আজ
প্রখর রৌদ্রে দগ্ধ আমার পথ,
ছায়া-সন্ধানে আজ মনে মানি লাজ
দুর্বার বেগে ছুটিতেছে জয়রথ।

চমকিযা উঠি তোমরা পথের ধারে
সহসা নয়নে জাগো আধ-ফোটা ফুল,
বাতাসে মদির করিয়া গন্ধভারে—
অতি-সাবধানী তাবো ঘটে যায় ভুল।

মনের কামনা—তোমাদেব মাঝে থাকি,
সমুখের ডাক কাঁদিয়া মরুক দূরে,
তোমাদের হাতে তাপিত হস্ত রাখি
গান গেয়ে যাই কাজ-ভোলানোর সুরে।

হায় রে কামনা, পিছনের বোঝা আসি
সমুখে আমারে ঠেলিতেছে অহরহ,
তারি মাঝখানে তোমাদেবে ভালোবাসি
রচিনু কবিতা, তোমরা তাহাই লহ।

যদি কোনোদিন থেমে যায় মোর চলা
পিছনে ফেরার পাই যদি অবসর,
তোমাদের সাথে সেদিন সাধিব গলা
তোমাদের মাঝে সেদিন বাঁধিব ঘর।

তুমি

বিপুল ধরার দুর্গম পথে-পথে
তুমিই রয়েছ সহস্র রূপ ধরি,
আমারে চালায়ে লইতেছ কোনমতে
তাই বার-বার তোমারে প্রণাম করি।
দিনের ঝলক রাতের তমসা মাঝে
ভাষাহীন আশা-আশ্বাস তব বাজে,
আলো নিবে যায় তিমির-ভ্রান্ত সাঁঝে
সমুখে দীর্ঘ ভয়ার্ত শর্বরী,—
তখনি তোমার তারা-ঝলমল রথে
তুমি জেগে ওঠ, ক্লান্ত নয়ন 'পরি।

কত বার-বার ক্ষণ-কুয়াশার মোহে
তুমি যে রয়েছ সে কথা গিয়েছি ভুলে,
কত বার-বার সুরভির সমারোহে
গাঢ় অনুরাগে চাপিয়া ধরেছি ফুলে।
ফুলের আড়ালে তোমার সম্ভাবনা
হারাইয়া গেছে, হায় রে অন্যমনা,
পারিনি ধরিতে সূক্ষ্মের ব্যঞ্জনা
পরশলোলুপ কামনা করেছি স্থূলে ;
যেটুকু পেয়েছি শুধু তারি আগ্রহে
কে দিল তাহারে দেখি নাই চোখ খুলে।

এমনি করিয়া কেটে গেল বহুদিন,
কত যে কাটিবে হিসাব কে রাখে তার?
আমি দেখিয়াছি সুরপ্রগল্ভ বীণ,
দেখিনি কাহার পরশে কাঁপিছে তার।
সে পরশখানি বিরাজে ভুবনময়,
বিশ্বাস নাই, শুধু আছে সংশয়
ঘুমের মাঝারে জননীর বরাভয়
করে অনুভব শিশুরাই অনিবার—
শিশুর মতন নহি আমি স্নেহলীন
সংশয়-মূঢ় তাই মোর হাহাকার।

অনেক দুঃখ দিয়েছি জীবনভোর,
ভাণ্ডারে তব জানি-জানি আছে ক্ষমা

দৃঢ় করিতেছ প্রতিদিন মায়াডোর,
যা করিবে দান সকলি করিছ জমা
এ ভরসা মনে নাহি থাকে অহরহ.
লোভী মন কয়, যা পার কাড়িয়া লহ,
সুমুখে তোমার দুর্গম কালীদহ,
দিবস অন্তে অমাবস্যার অমা—
ভাবিনাকো তুমি চির-আশ্রয় মোর,
কভু বা বন্ধু, কভু প্রিয়া মনোরমা।

আঘাতে-আঘাতে আমারে জাগায়ে রাখো,
বন্ধু, তোমার সেই গাঢ় ভালোবাসা,
আঘাতের ছলে তুমি কাছে-কাছে থাকো,
ব্যথিত জনের প্রতিদিন বাড়ে আশা।
জানি একদিন সবখানি দেবে ধরা,
সুন্দরতর হবে এ বসুন্ধরা,
বিশ্বাস আছে তাই কিছু নাই ত্বরা,
শুধু জানি তব প্রেম যে সর্বনাশা—
সুখসম্পদে যদি আজ মোরে ঢাকো,
সবই নেবে টেনে বন্যা সে কূল-ভাসা।

তুমি অনুখন স্মরণে থাকো না মম,
তাই ভুল হয়, মরি যে বিপথে ঘুরে,
'আমি-আমি' মোর গাঢ় অহমিকা-তম
'তুমি'রে আমার ঢেকেছে চিত্তপুরে।
হঠাৎ চমকে ভাঙিবে সে মোহ-ঘোর,
বুঝিব কে তুমি, আমি কতটুকু মোর,
নিমেষে ছিঁড়িবে 'আমি'র বাঁধন-ডোর
'তুমি' সুর হয়ে বাজিবে হৃদয় জুড়ে,
যে তুমি আড়ালে তাহারেই নমো নমঃ
যে তুমি নিকটে কবে সে মিলাবে দূরে।

জীবনীপঞ্জি

জন্ম ও পিতামাতা : সজনীকান্ত দাস ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৯ ভাদ্র শনিবার (২৫ আগস্ট, ১৯০০ সাল) বেতালবনে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরেন্দ্রলাল (মৃত্যু ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮) কানুনগো হিসাবে কর্মজীবন আরম্ভ করেন এবং ১৯২৬ সালে পার্টিশন-ডেপুটি-কালেক্টার রূপে অবসর গ্রহণ করেন। মাতা তুঙ্গলতা (মৃত্যু ১৭ জুলাই ১৯৩০) বর্ধমান জেলার মানকরের অনতিদূরে বেতালবন গ্রামের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারের কন্যা।

বাল্য ও কৈশোর : পৈত্রিক নিবাস বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে হলেও পিতা হরেন্দ্রলাল সরকারি চাকুরে হিসাবে উত্তরবিহার, মালদহ, পাবনা, দিনাজপুর -প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন সময়ে কর্মরত ছিলেন। পিতামাতার চতুর্থ পুত্র সজনীকান্ত বাল্যে নানা সময় মাতুলালয় বেতালবনে, রায়পুরে, বাঁকুড়ায় এবং পিতার কর্মস্থল মালদহ, পাবনা ও দিনাজপুরে অতিবাহিত করেন। তার ফলে তাঁর ছাত্রজীবন কিছু বিপত্তির মধ্যে পড়েছিল। অবশেষে দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে ১৯১৮ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তি লাভ করেন।

কলেজ-জীবন : দিনাজপুরে বাসকালে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সজনীকান্তের যোগাযোগ হয়। ফলে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া সম্ভব হয়নি। তার বদলে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বাঁকুড়ায় মিশনারি কলেজে তিনি আই.এস সি ক্লাসে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে আই.এস সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উচ্চস্থান অধিকার করেন। তারপর স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে রসায়নে অনার্স নিয়ে বি.এস সি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। সেখান থেকে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যান। কিন্তু নানা ঘটনায় মদনমোহন মালব্যের বিরক্তি উৎপাদন করায় দু-মাসের মধ্যে বারাণসী পরিত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং পদার্থবিদ্যায়

এম.এস সি ক্লাসে ভরতি হন। দু-বছর পরে পরীক্ষার আগে বকেয়া মাইনে ও পরীক্ষার ফি বাবদ মোটা টাকা চেয়ে পাঠান পিতার কাছে। পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে জানান। কিন্তু কোনো সদুত্তর না আসায় পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। এরপর সজনীকান্ত আর্থিক দায়িত্ব থেকে পরিবারকে অব্যাহতি দেন।

সতেরোখানা খাতা

ততদিনে সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ জন্মেছে। ছাত্রজীবন থেকেই অন্যায়ের প্রতিবাদ তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দেয়। স্কুলে থাকতেই পাঠ্য ও অপাঠ্য অজস্র বই পড়ার অভ্যাস হয়েছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু অর্থাভাবের জন্য বই কেনা সম্ভব ছিল না। তাই খাতায় রবীন্দ্রনাথের পদ্য ও গদ্য নানা রচনা লিখতে শুরু করেন। সতেরোখানা খাতা অনুলিখনে পূর্ণ হয়ে যায়। 'গোরা'র মতো বিরাট উপন্যাসও তার অঙ্গীভূত ছিল। সজনীকান্ত পরিণত জীবনেও গোরার অনেক অংশ মুখস্থ বলতে পারতেন। এই অসামান্য নিষ্ঠা এবং অতুলনীয় অধ্যবসায় রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করেছিল। তিনি অনেককে খাতাগুলি দেখিয়েও ছিলেন।

শনিবারের চিঠি

'শনিবারের চিঠি' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এবং যোগানন্দ দাসের সম্পাদনায় ১০ শ্রাবণ ১৩৩১ শনিবার (২৬ জুলাই ১৯২৪) প্রথম প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক ব্যঙ্গ হিসাবে এর প্রবর্তনা। 'চিঠি'র প্রথম সাত সংখ্যায় সজনীকান্তের কোনো যোগ ছিল না। অষ্টম সংখ্যায় 'ভাবকুমার প্রধান' -ছদ্মনামে তিনি লেখক হিসাবে আবির্ভূত হন। তারপর তাঁর স্বকপোলকল্পিত কামস্কাট্‌কিান ছন্দে তিনি রঙ্গ-ব্যঙ্গ কবিতার সূত্রপাত করেন। রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-পত্রিকায় সজনীকান্ত সাহিত্যিক-ব্যঙ্গ প্রচলন করেন। ধীরে-ধীরে সাহিত্যের ব্যঙ্গই প্রাধান্য লাভ করতে থাকে।

প্রবাসী

'শনিবারের চিঠি'র মধ্যস্থতায় এবং অশোক চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় প্রবাসী আপিসে পুলিনবিহারী দাসের 'লাঠিখেলা ও অসি-শিক্ষা' পুস্তকাকারে প্রকাশে সহায়তার জন্য সজনীকান্ত মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। কর্মদক্ষতার গুণে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকার প্রুফরিডার, তারপর সহ-সম্পাদক এবং সবশেষে প্রবাসী প্রেসের মুদ্রাকর ও কার্যাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। প্রবাসীর সঙ্গে প্রায় ছ-বছর (১৯২৪-৩০)

যুক্ত ছিলেন। প্রবাসীর প্রথম যুগে (৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫) আলিপুরে অবস্থানকারী রবীন্দ্রনাথের 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থের শ্রুতিলিখনের জন্য তিনি প্রেরিত হন। রবীন্দ্রনাথ নোট দেখে বলে যেতেন, সজনীকান্ত সঙ্গে-সঙ্গে লিখে রাখতেন। কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই টেবিলে আহার ও একই ঘরে রাত্রিযাপন করার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।

বঙ্গশ্রী : শনিবারের চিঠি নবপর্যায়ে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। ১৩৩৬ সালের কার্তিক পর্যন্ত চলার পর পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালের আশ্বিনে। সজনীকান্ত প্রথমে সহ-সম্পাদক এবং পরে সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। মাঝখানে, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৩২, মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানির কর্মকর্তা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের আহ্বানে তিনি তাঁর পাবলিশিং হাউসের কর্ণধার এবং তাঁর মাসিক পত্রিকার সম্পাদক-পদে নিয়োজিত হন। তখন তাঁর মাসিক বেতন হয় ৩০০ টাকা। কিন্তু রক্ষণশীলতার গণ্ডিতে বন্দী থাকা সজনীকান্তের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। ভট্টাচার্যের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি দু-বছর দু-মাস পরে পদত্যাগ করেন। সজনীকান্তের সম্পাদনায় 'বঙ্গশ্রী' অতি উচ্চশ্রেণীর মাসিকে পরিণত হয়। তিনি যতদিন বঙ্গশ্রীর সম্পাদক ছিলেন, চাকরির সর্তানুসারে, ততদিন পরিমল গোস্বামী শনিবারের চিঠির সম্পাদক হন।

বিচিত্র ক্রিয়াকর্ম প্রবাসী প্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হওয়ার পর সজনীকান্ত কিছুদিন 'হিজ মাস্টারস ভয়েস' ও 'সেনোলা কোম্পানি'র গ্রামোফোন রেকর্ডের সংগীত রচনা করেন। তাছাড়া নলিনীকান্ত সরকারের চেষ্টায় বেতারে 'শনিমণ্ডলীর আসর'-এর পরিচালক হিসাবে চুক্তিবদ্ধ হন। কিছুদিন আনন্দবাজার পত্রিকার শনিবারের কাগজে শনিবারের চিঠির জন্য এক পৃষ্ঠা রক্ষিত থাকতো। এই সময় একাধিক পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। কয়েকমাসের জন্য 'অলকা' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। অলকার প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' নাটক প্রকাশিত হয়েছিল।

চলচ্চিত্র-জগৎ সবচেয়ে আর্থিক সাফল্য এসেছিল চলচ্চিত্র জগৎ থেকে। ১৯৩৭ সালে প্রমথেশ বড়ুয়ার আমন্ত্রণে নিউ থিয়েটার্সের 'মুক্তি' ছবির কাহিনী সংলাপ ও গান রচনা করেন। 'মুক্তি' বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সেই থেকে তিনি চলচ্চিত্র

সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে নীতীন বসুর উদ্‌যোগে বম্বে গিয়ে তিনি 'নৌকাডুবি'র চিত্রনাট্য 'বম্বে টকিজ'-এর জন্য প্রস্তুত করেন। 'নৌকাডুবি' বাংলা ও হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হয়। হিন্দু সংস্করণের নাম ছিল 'মিলন'। ১৯৪৭ সালে রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' গল্পের চিত্রনাট্য রচনা করেন। পর বৎসর বম্বে টকিজ-এর জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' অবলম্বনে 'সমর'-নামক চিত্রনাট্য রচনা করেন। হিন্দি সংস্করণের নাম 'মশাল'। ১৯৪৯ সালে 'রাধারানী'র চিত্রনাট্য ও দুটি গান রচনা করেন। ১৯৫০ সালে শরৎচন্দ্রের মেজদিদি ও শ্রীকান্ত-এর চিত্রনাট্য ও গান প্রস্তুত করেন।

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস : শনিবারের চিঠি প্রবাসী প্রেস থেকেই মুদ্রিত হচ্ছিল। ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে 'কান্তিক' প্রেসে মুদ্রিত হতে থাকে। পত্রিকার কার্যালয় ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। সেখান থেকে ঠিকানা বদল করে ৫সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিটে আপিস উঠে আসে। ৫এ-তে হেমন্তবালা দেবীরা থাকতেন। শিশু উমা তুরতুর করে রাস্তায় বেরিয়ে যেত। হেমন্তবালা শিশুটির দিকে নজর রাখতেন। রাস্তা থেকে উমাকে ধরে এনে অনেক খেলনা উপহার দিতেন। হেমন্তবালা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সজনীকান্তের মিলনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কিছুটা সফলও হয়েছিলেন।

মূলত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' প্রকাশের জন্য সজনীকান্ত রঞ্জন প্রকাশালয় (পরে পাবলিশিং হাউস) প্রতিষ্ঠা করেন। এরপরে শনিরঞ্জন প্রেস, শনিবারের চিঠির কার্যালয় এবং রঞ্জন প্রকাশালয় ২৫।২ মোহনবাগান রো-র ভাড়া বাড়িতে উঠে আসে। ১৩৫৫ সালের ফাল্গুন মাসে শনিরঞ্জন প্রেস, শনিবারের চিঠির আপিস ও রঞ্জন পাবলিশিং হাউস সজনীকান্তের নবনির্মিত বাসভবন বেলগাছিয়ার ৫৭ ইন্দ্রবিশ্বাস রোডে পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও 'বনফুল'-প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে।

বাংলা সংস্কৃতি-বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী সিভিলিয়ান বিনয়রঞ্জন সেনের মধ্যস্থতায় ঝাড়গ্রাম-রাজের দানে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে তিন খণ্ডে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হিসাবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাসের নাম মুদ্রিত হয়েছিল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্তকে সাহিত্য পরিষদে নিয়ে যান। সজনীকান্ত পরিষদের আজীবন সদস্য এবং কার্য-নির্বাহক সমিতির সম্পাদক, সভাপতি-প্রভৃতি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৩৩৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে বিনয়রঞ্জন পুনরায় দশ হাজার টাকা ঝাড়গ্রামরাজের ভান্ডার থেকে বঙ্কিম-রচনাবলী প্রকাশের জন্য সজনীকান্তের কাছে অর্পণ করেন। সজনীকান্ত সেই দান পরিষদের তহবিলে সমর্পণ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের যুগ্ম-সম্পাদনায় ৯ খন্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় রচনা প্রকাশিত হয়। সেই থেকে দুজনে মিলে মধুসূদন, ভারতচন্দ্র, দীনবন্ধু, রামমোহন, দ্বিজেন্দ্রলাল (কবিতা ও গান), রামেন্দ্রসুন্দর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বলেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, অক্ষয় বড়াল ও নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী এবং আলালের ঘরের দুলাল, পালামৌ, শকুন্তলা, সীতার বনবাস-প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তাছাড়া বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্র-রচনাবলীর 'অচলিত সংগ্রহ' দু-খন্ড প্রকাশিত হয়েছিল।

সজনীকান্ত গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে শ্রীরামপুর মিশন থেকে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করে 'বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস, আদিযুগ' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড বিদ্যাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সংসার-জীবন : ১৩৩০ সালে ৪ আষাঢ় (১৯ জুন, ১৯২৩) স্বগ্রামবাসী কলকাতাপ্রবাসী পশুপতিনাথ চৌধুরির জ্যেষ্ঠা কন্যা সুধারানীর সঙ্গে সজনীকান্তের বিবাহ হয়। তখন তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র। তাঁদের এক পুত্র রঞ্জন (জন্ম ৭ জুলাই, ১৯২৯) এবং পাঁচ কন্যা উমা, রমা, সোমা, মীরা আর ইরা। প্রায় চল্লিশ বছর সুখী দাম্পত্য-জীবন যাপনের পর ১৩৬৮ সালের ২৮ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২) রবিবার অপরাহ্নে বেলগাছিয়ায় নিজ ভবনে করোনারি থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তখন তাঁর বয়স বাষট্টিও পূর্ণ হয়নি।

রচনাবলী : উপন্যাস, রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক ছোটোগল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ মিলিয়ে সজনীকান্ত ৩০খানা গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা এগারো। কাব্যগ্রন্থের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত ছিল :

১. পথ চলতে ঘাসের ফুল : উদ্ভট কবিতা-সংকলন—চম্পুকাব্যও বলা চলে। ভাদ্র ১৩৩৬।

২. বঙ্গরণভূমে : জাতীয়তামূলক ব্যঙ্গ-কবিতা। অক্টোবর ১৯৩১।

৩. মনোদর্পণ : মনস্তত্ত্বমূলক ব্যঙ্গ-কবিতা। অক্টোবর ১৯৩১।

৪. অঙ্গুষ্ঠ : মূলত প্যারডি-কবিতার সংকলন। ২০ অক্টোবর ১৯৩১।

৫. রাজহংস : মুক্তবন্ধ-ছন্দে রচিত কবিতা। চৈত্র ১৩৪২।

৬. আলো-আঁধারি : বিচিত্র-কবিতা। বৈশাখ ১৩৪৩।

৭. কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল : সচিত্র হাসির কবিতা। ভাদ্র ১৩৪৭।

৮. পঁচিশে বৈশাখ : রবীন্দ্র-বিষয়ক কবিতা। বৈশাখ ১৩৪৯।

৯. মানস-সরোবর : মুক্তবন্ধ-ছন্দের কবিতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯।

১০. ভাব ও ছন্দ : পথ চলতে ঘাসের ফুল-এর পুনর্মুদ্রণ এবং মাইকেল-বধ কাব্য। মাঘ ১৩৪৯।

১১. পান্থ-পাদপ : অনেকান্ত-অনুরক্তির কবিতা। ১৫ কার্তিক, ১৩৬৭।